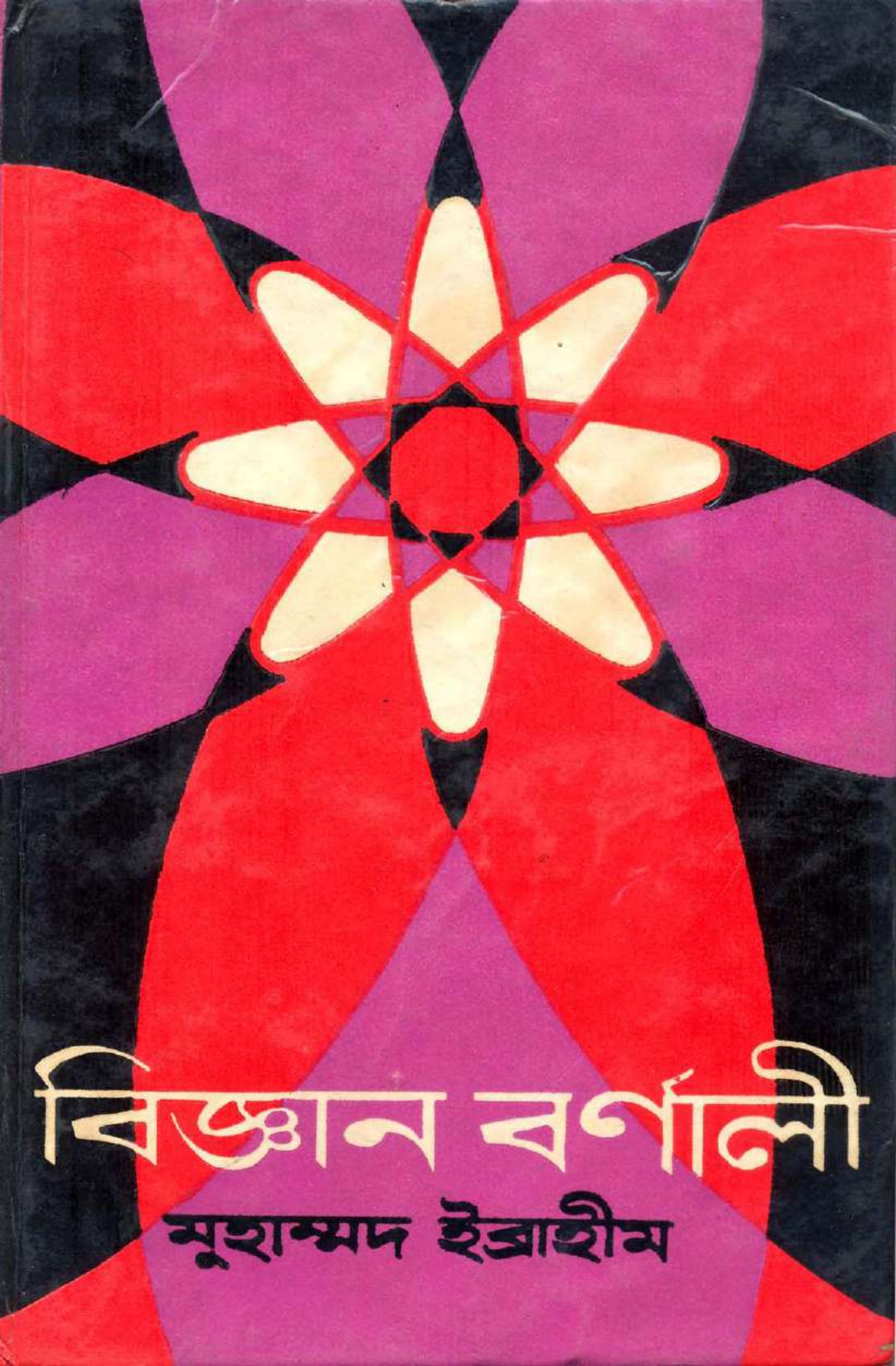

বিজ্ঞান বর্ণালী

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

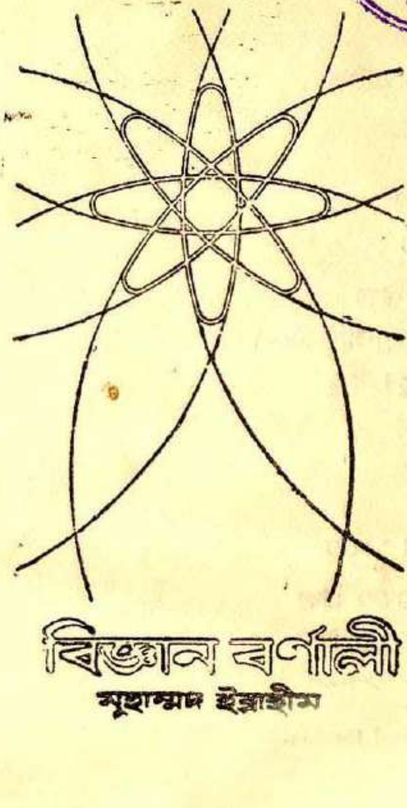

বিজ্ঞান বর্ণালী

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১১৫৫

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
প্রচ্ছদ-শিল্পী : নিতুন কুণ্ডু
মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

মূল্য : সাদা : ৩০.০০ টাকা
লেখক কাগজ : ২০.০০ টাকা

BIGGAN BARNALI
[Essays on Juvenile Science]
By Muhammad Ibrahim
Second Edition : February 1987
Cover Design : Nitun Kundu
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh

Price : Whiteprint : Taka 30.00
Lekhakprint : Taka 20.00

বিজ্ঞান সাময়িকীর
কর্মীদের

অথ সংখ্যা সংবাদ	১
রসায়নের ঘটকালী	৬
সম্ভাবনার জগৎ	১০
গোলমাল তত্ত্ব	১৫
জীবতাত্ত্বিক চিহ্নের ইতিকথা	২২
আপেল তবু পড়ে	২৬
সাত রঙে রাঙা	৩০
পরমাণুঃ যুগে যুগে	৩৬
চলমান ভূভাগ	৪১
চমকপ্রদ	৪৬
অতিপরিবহণের রহস্য	৫৭
লেজারঃ একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা	৬৫
পদার্থবিদ্যার পরিসর	৭০

অথ সংখ্যা সংবাদ

চোখটা বুজে এক মুহূর্ত চিন্তা করুন দেখি। দেখবেন আপনাকে ঘিরে রয়েছে শুধু সংখ্যা আর সংখ্যা. ছোট বড় মাঝারি হরেক আকারের, হরেক বহরের স্রেফ কতগুলো সংখ্যা। আপনার জীবনটাই কতগুলো সংখ্যার যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। একটার শুরু সূচিত হচ্ছে জ্ঞাত একটা সংখ্যা দিয়ে আর শেষটা সূচিত হবে অজ্ঞাত আরেকটা সংখ্যা দিয়ে, এর মাঝের ফাঁকটুকু অসংখ্য সংখ্যার ঠাসাঠাসিতে ভরা। আজকের দিনটাই ধরুন, সেই সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় ৫টা ৫০ মিনিট। তারপর থেকে সংখ্যা কি আপনাকে নিস্তার দিয়েছে? মিটার ব্যাণ্ড, কিলো-সাইক্‌ল্‌স, অফিস টাইম, রোল নাম্বার, পার্সেন্টেজ, বোলিং এভারেজ, অলিম্পিক রেকর্ড, লুমুম্বা বাহিনীর অগ্রগতি, শুক্রগামী রকেটের ওজন, সুদের হার, পাটের দর, ট্যাক্স, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, স্পীড লিমিট, তুফানের ক্ষয়ক্ষতি, প্রাইজ বণ্ড, আদমশুমারী, মুদ্রা বিনিময় তালিকা—আরো কত কি যে সংখ্যার কচ্‌কচানিতে আপনার মাথাটা ভর্তি হয়ে আছে তা কি আর বুঝছিনা। তবু অনর্থক আরো সংখ্যার কথা শুনাচ্ছি বলে আগে ভাগেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

মানুষের জীবনে সংখ্যার এই রাজত্বটা কিন্তু চিরন্তন না। চিরকালই মানুষ এভাবে সংখ্যার পাকে পাকে জড়ানো ছিলনা। এমনও দিন ছিল যখন মানুষ বড় সংখ্যা কাকে বলে চিনতই না। এ নিয়ে কোন মাথা ঘামাবার দর-কারও তারা অনুভব করেনি। সাবেক আমলের একটা গল্প বলি। হাঙ্গেরী দেশের দুই পণ্ডিত বাজী রেখেছেন, সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা কে বলে দিতে পারে। প্রথম পণ্ডিত বললেন, 'আচ্ছা আপনিই বলুন আপনার সংখ্যাটা।' দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন অপেক্ষাকৃত চালাক। তিনি সবচেয়ে বড় যে সংখ্যাটির কথা মনে করতে পারলেন তাই বলে দিলেন—'তিন'। প্রথম পণ্ডিত তো পড়ে গেলেন মহাচিন্তায়! এর চেয়ে বড় সংখ্যা আর কি হতে পারে? শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তা হলে আপনিই জিতলেন।' আজকালকার দিনে এমন একটি বাজীর কথা চিন্তা করুন তো। স্পষ্টই বুঝতে পারছেন এ বাজী

অথ সংখ্যা সংবাদ

চোখটা বুজে এক মুহূর্ত চিন্তা করুন দেখি। দেখবেন আপনাকে ঘিরে রয়েছে শুধু সংখ্যা আর সংখ্যা. ছোট বড় মাঝারি হরেক আকারের, হরেক বহরের স্রেফ কতগুলো সংখ্যা। আপনার জীবনটাই কতগুলো সংখ্যার যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। একটার শুরু সূচিত হচ্ছে জ্ঞাত একটা সংখ্যা দিয়ে আর শেষটা সূচিত হবে অজ্ঞাত আরেকটা সংখ্যা দিয়ে, এর মাঝের ফাঁকটুকু অসংখ্য সংখ্যার ঠাসাঠাসিতে ভরা। আজকের দিনটাই ধরুন, সেই সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় ৫টা ৫০ মিনিট। তারপর থেকে সংখ্যা কি আপনাকে নিস্তার দিয়েছে? মিটার ব্যাণ্ড, কিলো-সাইক্‌ল্‌স, অফিস টাইম, রোল নাম্বার, পার্সেন্টেজ, বোলিং এভারেজ, অলিম্পিক রেকর্ড, লুমুম্বা বাহিনীর অগ্রগতি, শুক্রগামী রকেটের ওজন, সুদের হার, পাটের দর, ট্যাক্স, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, স্পীড লিমিট, তুফানের ক্ষয়ক্ষতি, প্রাইজ বণ্ড, আদমশুমারী, মুদ্রা বিনিময় তালিকা—আরো কত কি যে সংখ্যার কচ্‌কচানিতে আপনার মাথাটা ভর্তি হয়ে আছে তা কি আর বুঝছিনা। তবু অনর্থক আরো সংখ্যার কথা শুনাচ্ছি বলে আগে ভাগেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

মানুষের জীবনে সংখ্যার এই রাজত্বটা কিন্তু চিরন্তন না। চিরকালই মানুষ এভাবে সংখ্যার পাকে পাকে জড়ানো ছিলনা। এমনও দিন ছিল যখন মানুষ বড় সংখ্যা কাকে বলে চিনতই না। এ নিয়ে কোন মাথা ঘামাবার দর-কারও তারা অনুভব করেনি। সাবেক আমলের একটা গল্প বলি। হাঙ্গেরী দেশের দুই পণ্ডিত বাজী রেখেছেন, সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা কে বলে দিতে পারে। প্রথম পণ্ডিত বললেন, 'আচ্ছা আপনিই বলুন আপনার সংখ্যাটা।' দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন অপেক্ষাকৃত চালাক। তিনি সবচেয়ে বড় যে সংখ্যাটির কথা মনে করতে পারলেন তাই বলে দিলেন—'তিন'। প্রথম পণ্ডিত তো পড়ে গেলেন মহাচিন্তায়! এর চেয়ে বড় সংখ্যা আর কি হতে পারে? শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তা হলে আপনিই জিতলেন।' আজকালকার দিনে এমন একটি বাজীর কথা চিন্তা করুন তো। স্পষ্টই বুঝতে পারছেন এ বাজী

কোনদিন শেষ হবেনা, যদি না অবশ্য কেউ ফস করে বলে উঠে – 'ইন্‌ফিনিটি'। কিন্তু তাতেই বা আপনি বাজী হারতে যাবেন কেন। ইন্‌ফিনিটি তো ঠিক সংখ্যা নয়, এতো তিলিস্মাতের খেল্‌। রবারের ব্যাণ্ডের মত, যতই টানেন লম্বা হবে।

সেই হাঙ্গেরীর পণ্ডিতদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আফ্রিকার হটেন্‌টটদের নাম শুনেছেন তো ? এদের যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমার ছেলে কয়টা কিংবা কয়টা শত্রু তুমি সাবাড় করেছ, তা যদি তিনের থেকে বেশী হয় এরা স্রেফ বলে দেবে 'অনেক'। সংখ্যার যুগ এই বিংশ শতাব্দীতেও এরা এক, দুই আর তিন অবধি গুণেই খুশী।

এ তো গেল অসভ্য যুগ আর অসভ্য জগতের কথা। এবার যাদের সভ্য বলতে আপনার আপত্তি থাকতে পারে না সেই রোমান ও গ্রীকদের কথায় আসুন। সংখ্যাবিদ্যা তখন বেশ কিছু এগিয়ে গেলেও আজকালকার মত খুব বড় বড় সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে এদের মাথাও গুলিয়ে যেতো। পৃথিবীতে যত বালু কণা আছে তারো যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তা যত বড়ই হোক না কেন, এই সত্যটা বুঝতে এবং বুঝাতে আর্কিমিডিসের মত শক্ত মাথার দরকার হয়েছিল। আর বড় বড় সংখ্যা নিয়ে এরা বিব্রত বোধ করবেই না বা কেন ? এরা তো আর লীলাবতীর খেল্‌ জানতনা, আর দশের মাথায় ছোট্ট একটা ৭ বসিয়ে এক কোটির মত লাগাম ছাড়া একটা সংখ্যাকে পোষ মানিয়ে রাখার বিদ্যাও এদের জানা ছিল না। জুলিয়াস সীজারের সমর দফতরের সেই কেরানীর কথাই ভাবুন দেখি। ৮৭৩২ এর মত একটা ছোট সংখ্যা লিখতেও বেচারাকে লিখতে হতো MMMMMMMMDCCXXXII। দশ লক্ষের মত একটা সংখ্যা লিখতে বেচারাকে M এরপর M এতবার বসিয়ে যেতে হতো যে পুরা একটা ফুলস্কেপ কাগজেও কুলোত না।

ভাগ্যিস আমাদের ভারতীয় আর আরবীয় অঙ্কদাদুরা তাঁদের নব ধারাপাতের শতকিয়াটা দিয়ে গিয়েছিলেন (এটাকে বরং বলা উচিত দশকিয়া)। এক থেকে নয় পর্যন্ত কতগুলো চিহ্ন আর গোলগাল একটা শূন্য। শূন্যটার মধ্যেই যত তিলিসমাতী। এর মানে হল 'কিছুই না'। কিন্তু কারো ডানে বসতে পারলে এটা অনেক কিছু। আমাদের অঙ্ক দাদুদের অবিস্মরণীয় আবিষ্কার এটি। এই দশটা পুঁজিই আপনার দরকার, তারপর লিখে যান যত বড় সংখ্যা লিখতে চান। কেবল বালু কেন, পৃথিবীতে কত পরমাণু আছে তারও হিসেব করে ফেলুন, পুঁজি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। দাদুদের এই বিদ্যেটা অবশ্য ইউরোপে পাচার হতে দেরী হয়নি। আমাদের পদ্ম-মহা-

কোনদিন শেষ হবেনা, যদি না অবশ্য কেউ ফস করে বলে উঠে – 'ইন্‌ফিনিটি'। কিন্তু তাতেই বা আপনি বাজী হারতে যাবেন কেন। ইন্‌ফিনিটি তো ঠিক সংখ্যা নয়, এতো তিলিস্মাতের খেল্। রবারের ব্যাঙের মত, যতই টানেন লম্বা হবে।

সেই হাঙ্গেরীর পণ্ডিতদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আফ্রিকার হটেন্‌–টটদের নাম শুনেছেন তো ? এদের যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমার ছেলে কয়টা কিংবা কয়টা শত্রু তুমি সাবাড় করেছ, তা যদি তিনের থেকে বেশী হয় এরা স্রেফ বলে দেবে 'অনেক'। সংখ্যার যুগ এই বিংশ শতাব্দীতেও এরা এক, দুই আর তিন অবধি গুণেই খুশী।

এ তো গেল অসভ্য যুগ আর অসভ্য জগতের কথা। এবার যাদের সভ্য বলতে আপনার আপত্তি থাকতে পারে না সেই রোমান ও গ্রীকদের কথায় আসুন। সংখ্যাবিদ্যা তখন বেশ কিছু এগিয়ে গেলেও আজকালকার মত খুব বড় বড় সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে এদের মাথাও গুলিয়ে যেতো। পৃথিবীতে যত বালু কণা আছে তারো যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তা যত বড়ই হোক না কেন, এই সত্যটা বুঝতে এবং বুঝাতে আর্কিমিডিসের মত শক্ত মাথার দরকার হয়েছিল। আর বড় বড় সংখ্যা নিয়ে এরা বিব্রত বোধ করবেই না বা কেন ? এরা তো আর লীলাবতীর খেল্ জানতনা, আর দশের মাথায় ছোট্ট একটা ৭ বসিয়ে এক কোটির মত লাগাম ছাড়া একটা সংখ্যাকে পোষ মানিয়ে রাখার বিদ্যাও এদের জানা ছিল না। জুলিয়াস সীজারের সমর দফতরের সেই কেরানীর কথাই ভাবুন দেখি। ৮৭৩২ এর মত একটা ছোট সংখ্যা লিখতেও বেচারাকে লিখতে হতো MMMMMMMMDCCXXXII। দশ লক্ষের মত একটা সংখ্যা লিখতে বেচারাকে M এরপর M এতবার বসিয়ে যেতে হতো যে পুরা একটা ফুলস্কেপ কাগজেও কুলোত না।

ভাগ্যিস আমাদের ভারতীয় আর আরবীয় অঙ্কদাদুরা তাঁদের নব ধারা-পাতের শতকিয়াটা দিয়ে গিয়েছিলেন (এটাকে বরং বলা উচিত দশকিয়া)। এক থেকে নয় পর্যন্ত কতগুলো চিহ্ন আর গোলগাল একটা শূন্য। শূন্যটার মধ্যেই যত তিলিসমাতী। এর মানে হল 'কিছুই না'। কিন্তু কারো ডানে বসতে পারলে এটা অনেক কিছু। আমাদের অঙ্ক দাদুদের অবিস্মরণীয় আবিষ্কার এটি। এই দশটা পুঁজিই আপনার দরকার, তারপর লিখে যান যত বড় সংখ্যা লিখতে চান। কেবল বালু কেন, পৃথিবীতে কত পরমাণু আছে তারও হিসেব করে ফেলুন, পুঁজি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। দাদুদের এই বিদ্যেটা অবশ্য ইউরোপে পাচার হতে দেরী হয়নি। আমাদের পদ্ম-মহা–

পদ্যের অনুসরণে তাদেরও মুখে খই ফুটল—মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, কোয়াড্রিলিয়ন, কুইন্টিলিয়ন, সেক্স্‌টিলিয়ন, সেপটিলিয়ন, অকটিলিয়ন, নোবিলিয়ন, ডেসিলিয়ন ইত্যাদি আরো কত কি ! দশের কায়দায় এনে ফেলাতে সব সংখ্যাই কাবু। ভাগ্যিস যথাসময়ে তা হয়েছিল। নইলে আজকের বিজ্ঞানে পরমাণু জগত বা মহাজাগতিক বিষয়ে ঢুকলে এমন সব সংখ্যার সাক্ষাত পেতে হয় যাদের কিছুতেই পোষ মানানো যেত না। কিন্তু এই দশের পুঁজিটা কি একেবারেই অপরিহার্য ? মোটেই না। অতীতে বারো অথবা ষাটের ব্যবহারও চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। তবে খুঁব সম্ভব দু হাতে দশটা আঙ্গুল থাকায় গোণার সুবিধার জন্যই শেষ পর্যন্ত দশের হিসেবটা টিকে গেছে। আজকাল অবশ্য মাত্র দুটা চিহ্নের পুঁজি সম্বল করে আরেকটা হিসেব ব্যবহার করা হয় প্রধানতঃ কম্পিউটারের প্রয়োজনে। শুধু ১ আর 0 —এই দুটা চিহ্ন দরকার এতে, এ দিয়েই লেখা যায় যাবতীয় সংখ্যা। কম্পিউটারের তো আর হাত নেই, দশটা আঙ্গুলও নেই। হাঁ বা না, বিদ্যুৎ আছে বা বিদ্যুৎ নেই, বাতি জ্বল্‌ল কি বাতি নিভল এ রকম দুটা বিকল্প দিয়েই তার কাজ করার সুবিধা। তাই তার জন্য এই 'বাইনারি সিষ্টেম' বা দুইয়ের হিসেবের ব্যবস্থা।

আমাদের সেই অঙ্কদাদুরা তাঁদের অঙ্কের বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে বেকায়দায় ফেলতে কিন্তু কম ওস্তাদ ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। বিদ্যোৎসাহী বাদশা সিরহাম তখন হিন্দুস্তানের একটি রাজ্যের তখ্‌তে। তাঁরই মহাজ্ঞানী উযীর সীমা বিন দাহির আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত খেলা দাবা। বাদশা এতে মহাখুশী হয়ে উযীরকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। চতুর উযীর শুধু বললেন, 'বাদশাহ নামদার, হুজুরের অন্ন খেয়ে মানুষ, তাঁর কাছে আমার বেশী কি চাওয়ার আছে ? তবে আমার আরজ, আমার এই দাবার ছকটার প্রথম ঘরটাতে দেয়া হোক শস্যের একটা দানা, আর দ্বিতীয়টাতে দেয়া হোক দু'টা দানা, তৃতীয়টাতে চারটা, এভাবে প্রত্যেক ঘরে আগের ঘরের দ্বিগুণ করে দানা দিয়ে ছকের ৬৪টি ঘর পুরিয়ে দিলেই আমি খুশী।' বাদশাহ হেসে বল্‌লেন, 'এই বুঝি তোমার চাওয়া। বেশ তাই হোক। এই কে আছিস নিয়ে আয়তো এক বস্তা গম।' তাঁরই বা দোষ কি। তিনি তো জানতেন না গুণোত্তর হারে বৃদ্ধিটা কি সাংঘাতিক জিনিস। একটা, দু'টা চারটা, করে দানা দেওয়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এ কি ? ২0টা ঘর না পুরাতেই বস্তা খালাস! আনা হলো আরো বস্তা। কিন্তু সেই রাক্ষুসে ছকের ক্ষুধা কি তাতে মেটে! হিসেব করে দেখা যায় $১+২+২^{২}+২^{৩}+২^{৪}+\ldots\ldots+২^{৬২}+২^{৬৩}$ এই হিসেবে দাহিরের 'সামান্য'

পদ্যের অনুসরণে তাদেরও মুখে খই ফুটল—মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, কোয়াড্রিলিয়ন, কুইন্টিলিয়ন, সেকস্‌টিলিয়ন, সেপটিলিয়ন, অকটিলিয়ন, নোবিলিয়ন, ডেসিলিয়ন ইত্যাদি আরো কত কি! দশের কায়দায় এনে ফেলাতে সব সংখ্যাই কাবু। ভাগ্যিস যথাসময়ে তা হয়েছিল। নইলে আজকের বিজ্ঞানে পরমাণু জগত বা মহাজাগতিক বিষয়ে ঢুকলে এমন সব সংখ্যার সাক্ষাত পেতে হয় যাদের কিছুতেই পোষ মানানো যেত না। কিন্তু এই দশের পুঁজিটা কি একেবারেই অপরিহার্য? মোটেই না। অতীতে বারো অথবা ষাটের ব্যবহারও চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। তবে খুব সম্ভব দু হাতে দশটা আঙ্গুল থাকায় গোণার সুবিধার জন্যই শেষ পর্যন্ত দশের হিসেবটা টিঁকে গেছে। আজকাল অবশ্য মাত্র দুটো চিহ্নের পুঁজি সম্বল করে আরেকটা হিসেব ব্যবহার করা হয় প্রধানতঃ কম্পিউটারের প্রয়োজনে। শুধু ১ আর 0—এই দুটো চিহ্ন দরকার এতে, এ দিয়েই লেখা যায় যাবতীয় সংখ্যা। কম্পিউটারের তো আর হাত নেই, দশটা আঙ্গুলও নেই। হাঁ বা না, বিদ্যুৎ আছে বা বিদ্যুৎ নেই, বাতি জ্বল্‌ল কি বাতি নিভল এ রকম দুটো বিকল্প দিয়েই তার কাজ করার সুবিধা। তাই তার জন্য এই 'বাইনারি সিষ্টেম' বা দুইয়ের হিসেবের ব্যবস্থা।

আমাদের সেই অঙ্কদাদুরা তাঁদের অঙ্কের বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে বেকায়দায় ফেলতে কিন্তু কম ওস্তাদ ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। বিদ্যোৎসাহী বাদশা সিরহাম তখন হিন্দুস্তানের একটি রাজ্যের তখ্‌তে। তাঁরই মহাজ্ঞানী উযীর সীমা বিন দাহির আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত খেলা দাবা। বাদশা এতে মহাখুশী হয়ে উযীরকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। চতুর উযীর শুধু বললেন, 'বাদশাহ নামদার, হুজুরের অন্ন খেয়ে মানুষ, তাঁর কাছে আমার বেশী কি চাওয়ার আছে? তবে আমার আরজ, আমার এই দাবার ছকটার প্রথম ঘরটাতে দেয়া হোক শস্যের একটা দানা, আর দ্বিতীয়টাতে দেয়া হোক দু'টা দানা, তৃতীয়টাতে চারটা, এভাবে প্রত্যেক ঘরে আগের ঘরের দ্বিগুণ করে দানা দিয়ে ছকের ৬৪টি ঘর পুরিয়ে দিলেই আমি খুশী।' বাদশাহ হেসে বল্‌লেন, 'এই বুঝি তোমার চাওয়া। বেশ তাই হোক। এই কে আছিস নিয়ে আয়তো এক বস্তা গম।' তাঁরই বা দোষ কি। তিনি তো জানতেন না গুণোত্তর হারে বৃদ্ধিটা কি সাংঘাতিক জিনিস। একটা, দু'টা চারটা, করে দানা দেওয়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এ কি? ২০টা ঘর না পুরাতেই বস্তা খালাস! আনা হলো আরো বস্তা। কিন্তু সেই রাক্ষুসে ছকের ক্ষুধা কি তাতে মেটে! হিসেব করে দেখা যায় $১+২+২^{২}+২^{৩}+২^{৪}+\ldots\ldots+২^{৬২}+২^{৬৩}$ এই হিসেবে দাহিরের 'সামান্য'

দাবী মেটাতে দরকার মোট ১৮,৪৪৬,৭৭৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫টি দানার, যারা রাজ্যের শস্য ভাণ্ডার উজাড় করেও যা দেয়ার সাধ্য বাদশার ছিলনা। আজ যে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে বাড়ছে বলা হচ্ছে, তাতে আশঙ্কার কারণ আছে বৈ কি।

মনে করছেন বুঝি এসব সংখ্যা চিরদিনই দৈনন্দিন জীবনের শুকনো কচ্‌কচানি নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তা কিন্তু মোটেই নয়। প্রাচীন সংখ্যাতত্ত্ববিদদের রসবোধ আর কল্পনা শক্তি দুইই ছিল। তাঁদের উর্বর কল্পনা শক্তি সবগুলো সংখ্যাকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছিল। ১,৩,৫,৭... এসব বেজোড় সংখ্যা হলো স্ত্রী জাতীয় আর ২,৪,৬,৮...এসব জোড় সংখ্যা হচ্ছে পুরুষ জাতীয়। তাদের মধ্যে সার্থক বিয়ের মধ্য দিয়েই সংখ্যা বংশ ১, ২, ৩, ৪, ৫...এর অবাধ গতি। $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$-এর মতো সংখ্যাগুলো হলো আফোটা ডিম, যা দেখে বলার উপায় নেই এ কি ছেলে না মেয়ে। $\sqrt{-১}$ এর মত সংখ্যা হলো মায়াবী, আছেও আবার নেইও। শুধু কি তাই, সংখ্যাকে এরা স্বষ্টিকর্তার আসন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পীথাগোরাসের শিষ্যরা প্রার্থনা করত 'আমাদেরকে আশীর্বাদ কর, হে পবিত্র স্বর্গীয় সংখ্যা, দেবতা আর মানুষের স্বষ্টিকারী।' পীথাগোরাস বলতেন 'বস্তু সত্তা মানেই হলো সংখ্যা'।

সংখ্যার নানা গুঢ় অর্থ নিয়ে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান যাজকদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কম হয়নি। মার্টিন লুথার যখন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন, বানগাস্ নামক জনৈক ক্যাথোলিক যাজক ৭০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট বই লিখে প্রমাণ করে ছাড়লেন লুথারের নামের সাংখ্যমান ৬৬৬ হচ্ছে 'পশুদের সংখ্যা'। লুথারের এক বন্ধু পাল্‌টা আক্রমণ করে দেখালেন তখনকার পোপ দশম লিওর নাম রোমানে লিখলে হয় LEO DECIMVS। এর শেষ শব্দটার অক্ষরগুলো একটু নেড়েচেড়ে দিলে হয় MDCLVI অর্থাৎ ১৬৫৬। তখন নেড়েচেড়ে দেয়ার জন্য দশ ক্ষতিপূরণ দিলেই এটা হয় ১৬৬৬ অর্থাৎ কিনা ১০০০+৬৬৬। কিন্তু ১০০০ লেখা হয় 'M' দিয়ে যা কিনা ল্যাটিন Mysterium (রহস্য) শব্দের আদ্যাক্ষর। আর ৬৬৬ তো পশুর সংখ্যা আছেই। কাজেই এই বিচারে পোপ দশম লিও হচ্ছেন একজন রহস্যময় পশু।

আর তাদেরই বা দোষ দিতে যাব কেন? সংখ্যা নিয়ে নানা কুসংস্কার কি আপনার আমার মনেই কম। হলফ করে বলুন তো দেখি, পরীক্ষায় রোল নম্বর ১৩ পড়লে কিংবা আপনার বাড়ীর নম্বর ৪২০ হলে আপনি অস্বস্তি বোধ করেন না? এখন আর সংখ্যাকে নিয়ে সেই রসবোধও নেই, কল্পনার দৌড়ও নেই।

দাবী মেটাতে দরকার মোট ১৮,৪৪৬,৭৭৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫টি দানার, যারা রাজ্যের শস্য ভাণ্ডার উজাড় করেও যা দেয়ার সাধ্য বাদশার ছিলনা। আজ যে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে বাড়ছে বলা হচ্ছে, তাতে আশঙ্কার কারণ আছে বৈ কি।

মনে করছেন বুঝি এসব সংখ্যা চিরদিনই দৈনন্দিন জীবনের শুকনো কচ্‌কচানি নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তা কিন্তু মোটেই নয়। প্রাচীন সংখ্যাতত্ত্ববিদদের রসবোধ আর কল্পনা শক্তি দুইই ছিল। তাঁদের উর্বর কল্পনা শক্তি সবগুলো সংখ্যাকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছিল। ১,৩,৫,৭... এসব বেজোড় সংখ্যা হলো স্ত্রী জাতীয় আর ২,৪,৬,৮...এসব জোড় সংখ্যা হচ্ছে পুরুষ জাতীয়। তাদের মধ্যে সার্থক বিয়ের মধ্য দিয়েই সংখ্যা বংশ ১, ২, ৩, ৪, ৫...এর অবাধ গতি। $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$-এর মতো সংখ্যাগুলো হলো আফোটা ডিম, যা দেখে বলার উপায় নেই এ কি ছেলে না মেয়ে। $\sqrt{-১}$ এর মত সংখ্যা হলো মায়াবী, আছেও আবার নেইও। শুধু কি তাই, সংখ্যাকে এরা স্রষ্টিকর্তার আসন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পীথাগোরাসের শিষ্যরা প্রার্থনা করত 'আমাদেরকে আশীর্বাদ কর, হে পবিত্র স্বর্গীয় সংখ্যা, দেবতা আর মানুষের স্রষ্টিকারী।' পীথাগোরাস বলতেন 'বস্তু সত্ত্বা মানেই হলো সংখ্যা'।

সংখ্যার নানা গুঢ় অর্থ নিয়ে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান যাজকদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কম হয়নি। মার্টিন লুথার যখন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন, বানগাস নামক জনৈক ক্যাথোলিক যাজক ৭০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট বই লিখে প্রমাণ করে ছাড়লেন লুথারের নামের সাংখ্যমান ৬৬৬ হচ্ছে 'পশুদের সংখ্যা'। লুথারের এক বন্ধু পাল্‌টা আক্রমণ করে দেখালেন তখনকার পোপ দশম লিওর নাম রোমানে লিখলে হয় LEO DECIMVS। এর শেষ শব্দটার অক্ষরগুলো একটু নেড়েচেড়ে দিলে হয় MDCLVI অর্থাৎ ১৬৫৬। তখন নেড়েচেড়ে দেয়ার জন্য দশ ক্ষতিপূরণ দিলেই এটা হয় ১৬৬৬ অর্থাৎ কিনা ১০০০+৬৬৬। কিন্তু ১০০০ লেখা হয় 'M' দিয়ে যা কিনা ল্যাটিন Mysterium (রহস্য) শব্দের আদ্যাক্ষর। আর ৬৬৬ তো পশুর সংখ্যা আছেই। কাজেই এই বিচারে পোপ দশম লিও হচ্ছেন একজন রহস্যময় পশু।

আর তাদেরই বা দোষ দিতে যাব কেন? সংখ্যা নিয়ে নানা কুসংস্কার কি আপনার আমার মনেই কম। হলফ করে বলুন তো দেখি, পরীক্ষায় রোল নম্বর ১৩ পড়লে কিংবা আপনার বাড়ীর নম্বর ৪২০ হলে আপনি অস্বস্তি বোধ করেন না? এখন আর সংখ্যাকে নিয়ে সেই রসবোধও নেই, কল্পনার দৌড়ও নেই।

সংখ্যা এখন দৈনন্দিন জীবনে কতগুলো নিষ্প্রাণ, রূঢ় বাস্তবতার বাহন। সংখ্যা যে মানুষকে পাগল করে তুলতে পারে তা আপনি অনায়াসে অনুভব করবেন আদমশুমারীর কাজে থাকলে বা অঙ্কের পরীক্ষায় চক্রবৃদ্ধি সুদ বের করতে হলে। সংখ্যার এত কচ্‌কচানির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে আপনি নিশ্চয়ই সেই—হটেন্‌টটদের মত হয়ে থাকতে চাইছেন। এক, দুই, তিন ব্যাস। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজে সেভাবে থাকতে গেলেই আপনার স্থান নির্ঘাৎ পাগলা গারদে।

তাতেও কি সংখ্যার হাত থেকে রেহাই পাবেন বলে মনে করেন? কাকস্য পরিবেদনা! সেখানেও আপনার একটা নম্বর পড়বে, পাহারাদার সেখানেও হাঁকবে—সেল নম্বর ৭, পাগলা নম্বর ২০৩; সব ঠিক হ্যায়।

১৯৬১

রসায়নে ঘটকালী

দু'পক্ষ। বর পক্ষ আর কনে পক্ষ। এই তো সেদিনো এদের মধ্যে কোন চেনা-জানা ছিল না। সম্বন্ধটা ঘটালেন আমাদের কলিম চাচাই। কলিম চাচাকে কে না চেনে। ঘটকালী করে করে চুল পাকালেন তিনি। তারপর থেকে এ পক্ষ ও পক্ষের পরমাত্মীয়। কিন্তু কলিম চাচা রয়ে গেছেন সেই কলিম চাচাই। এবাড়ী গেলে আসুন বসুন মুখের কথা; পানটা, হুকোটা এগিয়ে দেয়া। ব্যাস এ পর্যন্তই। ওবাড়ীতেও তাই। কলিম চাচা ঘুরে ফেরেন নূতন জোটকের সন্ধানে।

পদার্থে পদার্থে মিলন-বিচ্ছেদের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে রসায়ন শাস্ত্র। কলিম চাচার মত একদল ঘটকের সাক্ষাত মিলে এখানেও। সম্বন্ধটা ঘটিয়ে দিয়েই এরা খালাস। তারপর সেই ঘটকেরপো সেই ঘটকেরপোই হয়ে যায়। এদেরকে ঘটকেরপো বলতে কিন্তু ভারী আপত্তি রসায়ন-বিদ্দের। কায়দা করে রসায়নের ভাষায় বলতে হবে ক্যাটালিষ্ট। এমনি অসংখ্য ঘটকের সাক্ষাত আপনি পাচ্ছেন রোজই। আপনার দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষগুলোর অনেকেরই তৈরী হওয়ার পেছনে রয়েছে ক্যাটালিষ্টের ঘটকালীর হাত। কিন্তু বিয়ের দাওয়াতে গিয়ে যেমন ঘটকের নাম জিজ্ঞেস করেন না তেমনি এসব জিনিষ তৈরী হতে কি ক্যাটালিষ্ট ব্যবহার হয়েছে না হয়েছে, তা নিয়েও আপনার কোন মাথাব্যথা নেই।

এ ধরনের ঘটকালীর একটা নমুনা এখুনি হাতে-নাতে দেখে নেন না কেন। চিনির একটা ডেলা নিয়ে ম্যাচের আগুনে তা পোড়াবার চেষ্টা করুন। কিছুতেই পুরবে না। অক্সিজেনে আর চিনিতে রাসায়নিক সম্বন্ধটা কিছুতেই ঘটবেনা, কারণ ঘটক নেই যে! ঘটক খুঁজতে বেশী দূরে যেতে হবে না। আপনার হাতেই তা রয়েছে। হাতের সিগারেটটা থেকে কিছু ছাই চিনির উপর ফেলে দিন। এবার জ্বালাবার চেষ্টা করলে দেখবেন চিনির ডেলাটা বেশ জ্বলছে। ঘটকের উপস্থিতি এমনিতরো অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। বলবেন, এসব ঘটকালীর কায়দা কি? চিনির ডেলা জ্বলল কি না জ্বলল তাতে আমার কি? ফায়দা আছে বৈকি। রাসায়নিক শিল্পে ক্যাটালিষ্টের ব্যবহার ব্যাপক। এই সালফিউরিক

এসিডের কথাই ধরুন। বলা হয়, কোন দেশের উন্নতির পরিমাণ বোঝা যায় তার সালফিউরিক এসিড খরচার হিসেব থেকে। এক যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে সালফিউরিক এসিড খরচ হয় এক কোটি টনেরও বেশী। ভেনাডিয়াম অক্সাইডের ঘটকালী ছাড়া এহেন প্রয়োজনীয় জিনিষটার চাহিদামাফিক উৎপাদন কিছুতেই সম্ভব হতো না।

এবার একটা ঘরোয়া উদাহরণই নেয়া যাক। আজকাল গিন্নীরা রান্না-বান্নায় বনস্পতি ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু তাঁরা কোনদিনই ভেবে দেখেননি যে, এ জিনিষটার অপ্রিয় গন্ধের জন্য একে তাঁরা ছুঁয়েও দেখতেন না যদি নিকেলের গুঁড়ো ঘটকালী করে এর সাথে হাইড্রোজেন গ্যাস মিশবার ব্যবস্থা করে না দিত।

ক্যাটালিষ্টের ব্যবহারে সবকিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে পেট্রোলিয়াম শিল্প। আগে স্রেফ তাপ আর চাপ প্রয়োগে তৈল পরিশোধন করা হত। এখন ক্যাটালিষ্টের প্রয়োগের ফলে পেট্রোলিয়ামের মান যেমন বেড়েছে, কাজও হয়েছে দ্রুততর। আগে যা ছিল 'থার্মাল ক্র্যাকিং' অর্থাৎ তাপ প্রয়োগে ভাঙ্গন, এখন তা হয়েছে 'ক্যাটালাইটিক ক্র্যাকিং'।

একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে ক্যাটালিষ্ট যেখানে যেভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন, এটা শুধু রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি বাড়াতে সাহায্যই করবে। প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর ক্যাটালিষ্ট আবার যথা পূর্বং তথা পরং। আবার একে ব্যবহার করা চলবে ক্যাটালিষ্ট হিসেবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নিজে অংশ গ্রহণ না করেই ক্যাটালিষ্ট কেমন করে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে? এটাতো আর যাদুকরের হাতের যাদু-লাঠি নয় যে ছুঁইয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে বৈ কি। তবে এর সবটুকু কচকচানি সবাই বিনা প্রতিবাদে হজম করবেনা বলে একটু আভাস দিয়ে ক্ষান্ত হব।

ক্যাটালিষ্ট তার কাজটা দু'রকমে করতে পারে। একটা হচ্ছে চেইন-রিয়্যাকশন জাতীয়। চেইন-রিয়্যাকশন বলতে ঠিক কি বুঝায় তাও ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। ম্যাচ কাঠির সামান্য আগুন দিয়ে একটা বড় কাগজের টুকরার এক কোণে একটু আগুন লাগিয়ে দেয়া হল। প্রথমে কোণাটাই জলতে লাগল। তারপর এর তাপের ছোঁয়া লেগে পাশে-পাশের জায়গাগুলোও জলতে লাগল ক্রমে ক্রমে। এভাবে আগুন ছড়াতে ছড়াতে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল পুরো কাগজটাই জলে ছাই হয়ে

গেছে। এভাবে ছড়িয়ে পড়াকেই বলে চেইন-রিয়্যাকশন। একই রকমের চেইন-রিয়্যাকশনের ফলেই সিগারেটের সামান্য আগুন থেকে পুরো একটা জঙ্গলই পুড়ে যেতে পারে। ক্যাটালিষ্টও রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় এমনি একটা চেইন-রিয়্যাকশনের সৃষ্টি করে থাকে যার ফলে প্রক্রিয়াটা হয় দ্রুত থেকে দ্রুত-তর, নিমিষে এটা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক, আরো ব্যাপকভাবে। কি ভাবে, সে প্রশ্নের জবাব দিতে হলে যেতে হবে আরো গভীরে, সেখানে আমরা আপাততঃ যেতে চাচ্ছিনা।

দ্বিতীয় যে প্রকারে ক্যাটালিষ্ট কাজ করতে পারে তা হচ্ছে, রাসায়নিক ক্রিয়াটা সংঘটিত হওয়ার অনুকূল একটা 'তল' সৃষ্টি করে। জুতোর ফিতেটা বাঁধতে আপনি যখন একপায়ে দাঁড়িয়ে ভয়ানক অসুবিধা বোধ করেন সে সময় একটা চেয়ারে বসতে পারলে আপনার কাজটা যেমন দ্রুততর হয় অনেকটা তেমন আর কি। ক্যাটালিষ্ট এখানে চেয়ারের কাজ করছে। কোন কিছুর একটা বড় ডেলাকে পিটিয়ে গুঁড়ো করে নিলে সে যে অনেকটা বেশী জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে তা কে না জানে। এতে করে প্রয়োজনীয় তলটুকু অনেক বেশী বিস্তৃত হচ্ছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন কেন লোহা বা নিকেলকে ক্যাটালিষ্ট হিসাবে ডেলার আকারে ব্যবহার না করে গুঁড়োর আকারেই করা হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় এতে যোগদানকারী পদার্থের অণুগুলো অতি পাতলা স্তরে এই তলের উপর ছড়িয়ে পড়ে, যাকে রসায়নের ভাষায় বলা হয় absorption। উপযুক্ত ক্যাটালিষ্টের তৈরী তলের উপর এভাবে ছড়িয়ে পড়লে যোগদানকারী পদার্থগুলোর অণুর স্বাভাবিক বিক্রিয়া অনেকগুণে বৃদ্ধি পায় ক্যাটালিষ্টের সংস্পর্শে এলে। ফলে প্রক্রিয়াটা হয় দ্রুত থেকে দ্রুততর। বিক্রিয়ার মধ্যবর্তী স্তরে হয়ত ক্যাটালিষ্টের তলের অণুগুলো এতে অংশগ্রহণও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উৎপাদ্য বস্তুর সাথে তার কোন বন্ধন থাকে না। এই তল পুনবার ব্যবহৃত হতে পাবে বিক্রিয়াশীল আরো নতুন অণুর জন্য।

বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য ক্যাটালিষ্টের। বৈজ্ঞানিকরা সব সময়ই বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়ার উপযোগী ক্যাটালিষ্টের সন্ধানকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। অনেক সময় ক্যাটালিষ্ট আবিস্কৃত হয়ে পড়ে নেহাত ভাগ্যজোরে। এপ্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। এক রসায়নবিদ ন্যাপথিলিনে সালফিউরিক এসিড ঢেলে রাসায়নিক ক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। হাতের কাছে অন্য কিছুর অভাবে তাঁর থার্মোমিটারটাকেই তিনি মিশ্রণটা নাড়াচাড়ার কাজে

ব্যবহার করছিলেন। হঠাৎ অসাবধানতা বশতঃ থার্মোমিটারটা ভেঙ্গে এর পারা-টুকু মিশ্রণে গড়িয়ে পড়ল। পারার সংযোগের ফলে আচমকা এমন সব রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটল যার ফলে একটা নতুন এসিডই তৈরী হয়ে পড়ল। এভাবে সম্পূর্ণ বরাতজোরেই আবিষ্কার হয়ে পড়ল ক্যাটালিষ্ট হিসাবে মারকুরিক সালফেটের ব্যবহার।

এতক্ষণ ধরে ক্যাটালিষ্ট সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হল। কিন্তু এর সবচেয়ে মূল্যবান যে ব্যবহারটা সে সম্বন্ধে বলা হলনা কিছুই। বললে বিশ্বেস করবেন যে আপনার শরীরের মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছে হাজারো রকমের ক্যাটালিষ্ট ? হ্যাঁ করছে বৈ কি। আর এরা আছে বলেই আপনি আছেন। আপনার শরীরের অসংখ্য অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যই এরা দায়ী। এ সব রাসায়নিক ক্রিয়ারই মোট ফলটা হচ্ছে 'জীবন'। এই শারীরিক ক্যাটালিষ্টগুলো প্রাণী-বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত 'এনজাইম' নামে। আপনার শরীরের প্রতিটি কোষেই নিত্য কাজ করে চলেছে অসংখ্য এনজাইম।

কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন ক্যাটালিষ্ট শুধু তেলটা ঘিটা আপনার ঘরে পৌছিয়ে দিতেই সাহায্য করে না ; আপনার জানটা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারেও তার হাত আছে। ঘটক হিসেবে কলিম চাচার চেয়ে তার বাহাদুরীটা কম কিসে ?

১৯৬১

সম্ভাবনার জগত

ষ্টেডিয়াম ভর্তি।...তবুও কতকটা স্তব্ধ পরিবেশ, কারণ দু'পক্ষের অধিনায়ক এখন মাঠে টস্ করতে নেমেছেন। বার্কী ছুঁড়ে দেবেন একটা পয়সা আর ডেক্সটার ডাকবেন চাঁদ না ফুল, আর তারই উপর অনেকটা নির্ভর করবে সারাদিনকার, চাই কি সারা খেলার ব্রাইট ক্রিকেট কিংবা ডাল ক্রিকেট, জাঁদরেল বেতার-বক্তার অশ্রান্ত বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণীর ঠ্যালা আর আমরা তাঁর অসংখ্য শ্রোতাদের অনিদ্রা কিংবা সুনিদ্রার ব্যবস্থা।

বার্কী ছুঁড়ে দিয়ে আর ডেক্সটার ত ডেকেই খালাস, কিন্তু পয়সার অবস্থাটা কি? আমরা না হয় ক্রিকেটে নিজ নিজ দলের গৌরবের জন্য গলা ফাটিয়ে মরলাম কিন্তু পয়সাটা চালিত হবে কোন আবেগের দ্বারা? না, তার ক্ষেত্রে শুধু ভাগ্যের কথা, সমান সম্ভাবনা, যতটুকু বার্কীর ঠিক ততটুকুই ডেক্সটারের, যাকে আমরা বলে থাকি 'ফিফটি ফিফটি চান্স' তাই। আচ্ছা, গেল বছরে ভারত সফরে গিয়ে ফজল যে প্রথম চারটা টেষ্টেই একাক্রমে টসে জিতে গেলেন, তার কি? সেখানে কনট্রাক্টরের জন্যও ত ফিফটি চান্স, অর্ধেকটা সম্ভাবনা ত তাঁরো ছিল। তবুও কেন কাজের বেলায় তাঁর চান্স ফললো পাঁচবারে মাত্র একবার। তা হলে ব্যাপারগুলো স্রেফ নিয়মের অরাজকতা, নসীবের খেল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে আসার আগে আমাদের অন্য দিকও দেখতে হবে। ধরা যাক পাঁচটার বদলে পরপর একশ'টা খেলার বন্দোবস্ত করা হলো কোন একটা বিশেষ মৌসুমে। সম্ভাবনাটা যদি নেহাত নসীবের খেলই হয়ে থাকে তা হলে ফজলের মত কোন ভাগ্যবান অধিনায়ক যদি একশ'র মধ্যে নব্বইটা, এমনকি একশ'টা টস্ও জিতে যান তাহলেও খুব বেশী আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবেনা। পাঁচে চার যে পেতে পারে, শ'তে নব্বই পেতে তার এমন কি বাধা। কিন্তু এমন ধারা ব্যাপার কস্মিনকালেও ঘটেনি, ঘটবেও যে না তা সংখ্যাতত্ত্ববিদগণ বুক ফুলিয়ে বলে থাকেন। এর কারণ এই নয় যে এক মৌসুমে একশ'টা টেষ্টের বন্দোবস্ত কোন দেশই করতে পারেনা। খেলার দরকার কি? নিজেই পয়সা একটা নিয়ে বসে যান না নিজেকে ক্রিকেট অধিনায়ক বলে ধরে নিয়ে। তারপর এক নাগাড়ে টস্ করে যান। যতই বেশীবার পয়সা ছুঁড়বেন ততই দেখবেন

মোট 'চাঁদ' আর মোট 'ফুলের সংখ্যা কাছাকাছি চলে আসছে। একশ'টা টসের পর দেখবেন উভয়ের অনুপাত ঠিক ৫০:৫০ না হোক ৫১:৪৯ কিংবা ৫২:৪৮ এর এদিক ওদিক বড় একটা হচ্ছে না। যদি টসের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে হাজারের কাছাকাছি নিয়ে যান বেশকমের মাত্রা এটুকুও থাকবে না। অদ্ভুতই বটে! পাঁচে চার পাওয়া যত সোজা, দশে আট পাওয়া তত সোজা নয় আর শ'তে আশি পাওয়া ত এক রকম অসম্ভবই, যদিও এদের অনুপাত একই।

এবার আমরা আদত জায়গায় এসে পড়েছি। সম্ভাবনাও তাহলে নিয়ম মেনে চলে। আর সে নিয়ম খাটে যখন বেশী সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু নিয়ে আমাদের কারবার। এ নিয়মকেই বলা হয় 'সম্ভাবনার সূত্র' (Law of probability), ক্রিকেট টস্ থেকে আরম্ভ করে পারমাণবিক বিজ্ঞানের বড় বড় সমস্যার সমাধানে যার অবাধ গতি। সে কথায় না হয় একটু পরে আসা যাবে। এখন একটা দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাক কেমন করে সম্ভাবনার সূত্র আমাদের সাধারণ ধারণাকে মিথ্যে বলে প্রমাণ করে দিতে পারে।

মনে করুন, আপনার এমন ২৪ জন বন্ধু রয়েছে যারা নিজেদের জন্মদিন পালন করে এবং তাতে আপনাকে অবশ্যি দাওয়াত করবেই। তা হলে একই দিনে দু'জন বন্ধুর জন্মদিনে দাওয়াত পাবার কতটুকু সম্ভাবনা আপনার আছে? বলবেন, নেহাত কাকতালীয় ভাবে ঘটে না গেলে এ ধরনের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা খুব কমই! মাত্র ২৪ জন লোকের মধ্যে দু'জনের জন্মদিন এক হতে যাওয়াটা ত মোটেই সচরাচর ঘটনা নয়। কিন্তু সম্ভাবনার সূত্র বলে, আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ নিয়ম অনুসারে সামান্য কিছু আঁক কষলেই আমরা দেখতে পাব, এরকম দু'বন্ধুর জন্মদিন একই দিনে না পড়াটাই বরং আশ্চর্যজনক। আমাদের ধারণার ঠিক বিপরীত ব্যাপার আর কি! দেখা যাবে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৪ জন বন্ধুর দুই বা ততোধিক জন্মদিন এক সাথে পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে শতকরা ৫৪ আর না পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে শতকরা ৪৬। কাজেই আপনার চব্বিশ বন্ধুর কোন দু'জনের জন্মদিনের দাওয়াত যদি এক সাথে না পান, তবে ফস্ করে এর সম্ভাবনা উড়িয়ে না দিয়ে আপনার এটা মনে করাই উচিত হবে যে হয়ত তাদের সবাই জন্মদিন উদ্‌যাপন করেনা আর এদের কেউ কেউ আপনাকে দাওয়াত করে না।

যদি বলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যে সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে শাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাদের অধিকাংশই নেয়া হয়েছে সম্ভাবনার সূত্র প্রয়োগের

মাধ্যমে, তাহলে এগুলোর উপর আস্থা অনেকটা হ্রাস পাওয়ারই কথা। কারণ দৈনন্দিন জীবনে কোন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে 'সম্ভবতঃ' 'বোধ হয়' 'হয়ত' প্রভৃতি শব্দকে আমরা অবিশ্বাসের চোখে দেখতেই অভ্যস্ত। ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হওয়াই উচিত। আসলে সম্ভাবনার নিয়মাবলী এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত যে বরং স্থূল, প্রত্যক্ষ গণনামূলক তথ্যসংগ্রহে ভুল থাকতে পারে। কিন্তু এতে ভুল থাকা অসম্ভব। এর প্রয়োগের ক্ষেত্র তাই অত্যন্ত ব্যাপক। এডগার এলেন পোর এক গোয়েন্দা কাহিনীতে এর সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত আছে। এতে নায়ক খুঁজে পেয়েছে জলদস্যুদের দ্বারা লিখিত একটা গুপ্তলিপি যাতে খুব সম্ভব কোন একটা ধন ভাণ্ডারের ঠিকানা বাতলানো আছে। লিপিখানিতে ইংরাজী বর্ণমালার নানা অক্ষর সমূহ আর সংখ্যাবলী ব্যবহার করা হয়েছিল। এ লিপির পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা হলো এক অদ্ভুত উপায়ে। এটা একটা পরীক্ষিত সত্য যে, ইংরাজী ভাষায় সব চাইতে বহুল ব্যবহৃত বর্ণ হচ্ছে 'e', সে জলদস্যুর গুপ্ত-লিপিতেই হোক আর সেক্সপীয়ারের সনেটেই হোক। অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে লম্বা লেখা না নিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না ব্যবহারের আধিক্যে e-এর পর যাদের স্থান ক্রমানুসারে তারা হচ্ছে a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k p, q, x, z। এখন গুপ্তলিপিটাতে পরীক্ষা করে দেখা হলো সব চাইতে বহুল ব্যবহৃত চিহ্ন কোনটা আর তাকে 'e' ধরে নেয়া হল। এমনি করে বাকী চিহ্নগুলোরও এক একটা অর্থ খাড়া করা হলো উপরের ক্রমকে ভিত্তি করে। এতে অবশ্য ভুলের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। তার কারণ সম্ভাবনার নিয়মের পক্ষে লিপিটি যথেষ্ট পরিমাণ দীর্ঘ ছিল না। আর এজন্যই শেষ পর্যন্ত এ লিপির পাঠোদ্ধার হয়ে উঠেনি। কিন্তু পদ্ধতিটা ছিল নিখুঁত, শুধু তার প্রয়োগ ঠিক জায়গায় করা হয়নি। বস্তুতঃ এধরনের ব্যাপারে সম্ভাবনার সূত্র অতি সহজে অথচ একান্তই নির্ভুল ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

নিউটনের আমল থেকেই এ বিশ্বকে একটা নিখুঁত যন্ত্র বলে মনে করা হয়ে আসছে। বিজ্ঞানী মাত্রই এদ্দিন বিশ্বেস করতেন যে প্রকৃতির যে কোন ঘটনাকেই 'কার্যকারণবাদের'মাধ্যমে যান্ত্রিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা কার্যকারণবাদকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে সম্ভাবনার নিয়মাব ি পরিচালিত অনির্দেশ্য-বাদকে (Principle of indeterminacy)। প্লাঙ্কের কণিকাবাদের (Quantum theory) অভ্যুত্থানেই সর্ব প্রথম এই নূতন মতবাদের সূচনা হয়ে বর্তমান অণুবিজ্ঞানে এটা সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিউটনীয় বিজ্ঞান যেখানে জোর

করে বলত 'ক' অবস্থা থেকে 'খ' অবস্থায় পরিণতি অনিবার্য, কারণ কার্য-কারণবাদ তাই বলে ; সেখানে আধুনিক বিজ্ঞান শুধু একথা বলতে সক্ষম যে 'ক' অবস্থা থেকে 'খ' বা 'গ' বা 'ঘ' বা অন্য অসংখ্য অবস্থায় পরিণতির সম্ভাবনা আছে। তবে 'গ' এর চেয়ে 'খ' এর সম্ভাবনা বেশী, 'ঘ' এর চেয়ে 'গ' এর সম্ভাবনা বেশী ইত্যাদি। সম্ভাবনা কার কতটুকু তার একটা আপেক্ষিক হিসেবও এটা দিতে পারে। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিস্কার করা যাক।

আপনি যে ঘরটাতে বসে এখন প্রবন্ধটা পড়ছেন তা বায়ুতে ভর্তি, একথা তো মানেন। আর বিজ্ঞানী বলেন গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো সব সময় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, এদিক ওদিক সব দিকে। এক একটা বিশেষ অণু চলে সম্পূর্ণ তার মর্জিমাফিক, এই চলছে, এই ধাক্কা খাচ্ছে আরেকটার সাথে আর অমনি দিক ফিরিয়ে ছুটছে আর এক দিকে। একেবারেই বিশৃঙ্খল এই আণবিক গতি বা কম্পন। কিন্তু নিউটনীয় বিজ্ঞান এদ্দিন মেনে নিয়েছিল যে, এই আণবিক কম্পনের সামগ্রিক ফল হবে, যে পাত্রে গ্যাসটা রয়েছে অণুগুলো তার চারিদিকে সমান ভাবে বিস্তৃত হয়ে একে পূর্ণ করে রাখবে সব সময়েই। নির্বিবাদে এ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়েছিল কারণ বাস্তব-ক্ষেত্রে এর অন্যথা হয়নি, আর হতে যে পারে সে কথা কেউ চিন্তাও করে দেখেনি। কিন্তু গতি যখন বিশৃঙ্খলই, কোন নির্দিষ্ট দিকের বালাই যখন নাই, তখন বহুতরো সম্ভাবনার মধ্যে এমনিতরো একটা সম্ভাবনাও তো দেখা দিতে পারে যে, সবগুলো অণু একজোট হয়ে একদিকে ছুটে গিয়ে ঘরের কোণায় গিয়ে জড়ো হবে। আগের দিনে বিজ্ঞানী বলতো এটা অসম্ভব। যথেষ্ট পরিমাণে সময় দেয়া হলে সত্যি সত্যি এটা ঘটতে পারে তবে আঁক কষলে দেখা যায় এসময়ের পরিমাণ হচ্ছে $১০^{২৯৯.৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৪}$ সেকেণ্ড যেখানে সারা বিশ্বের বয়স কিনা $১০^{১৭}$ সেকেণ্ডের বেশী নয়। কাজেই আপনি শ্বাস-রোধের আশঙ্কা না করে নির্ভয়ে পড়ে যেতে পারেন, আর নিউটনীয় বিজ্ঞানও নির্বিবাদে বলতে পারে ব্যাপারটা অসম্ভব। অফিসঘরে একটা বানর ঢুকে পড়ে যদি আন্দাজে বে-আন্দাজে টাইপরাইটারের চাবি টিপতে থাকে তবে সে উচ্চার্য, অনুচ্চার্য, অর্থছাড়া, আবোল-তাবোল, জ্ঞানগর্ভ অনেক কথাই লিখে ফেলতে পারে। আর যথেষ্ট পরিমাণ সময় দেয়া হলে তার হাত থেকে সেক্সপীয়ারের একটা পুরা সনেট বেরিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়, এমন কি যা কোনদিন ছাপা

হয়নি তাও। কিন্তু দরকারী সময়ের হিসেব করতে গেলে উপরের মতই বিদঘুটে আরেকটা সংখ্যার সাক্ষাত পেয়ে যাব বলে আমরা আগে ভাগেই মেনে নিই যে বানর সনেট লিখতে পারেনা।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সম্ভাবনাকে নেহাত কৌতুককর শাস্ত্রীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমরা জানি তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম পরমাণু এক একটা করে ভেঙ্গে গিয়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি-বিকিরণ ঘটে থাকে। মনে করা যাক কোন রেডিয়ামে দু'হাজার পরমাণু আছে। বিজ্ঞান বলতে পারে না এক বছর পরে এদের মধ্যে ক'টি পরমাণু টিকে থাকেবে। ২০০০, ১৯৯৯, ১৯৯৮ ইত্যাদি সংখ্যার আপেক্ষিক সম্ভাবনাই সে শুধু দিতে পারে। হয়ত সব চেয়ে বেশী সম্ভাবনা হচ্ছে ১৯৯৯ এর। দু'হাজার পরমাণুর মধ্যে কেবলমাত্র একটি ভাঙ্গারই সম্ভাবনা বেশী। মূলে এটুকু জানা না থাকলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কারবার চলে না। আধুনিক বিজ্ঞান বলে পদার্থের মৌলিক কণিকা ইলেকট্রন প্রভৃতি আর শক্তির একক ফোটন আলাদা কোন জিনিস নয়। এদের একে অন্যতে পরিণত হতে পারে। কাজেই একটা ইলেকট্রনের কি ধর্ম তা স্থির করতে কণিকাবাদ আর তরঙ্গবাদ এ দু'য়ের বিবাদ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু কোন পদার্থবিদের পক্ষে একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনের ধর্ম নিয়ে চিন্তা করার কোন অর্থ হয় না। তাঁর কারবার হচ্ছে ইলেকট্রনের রশ্মি বা ঝাঁক নিয়ে। তাদের সমষ্টিগত সংখ্যাতত্ত্বের সম্ভাবনা সূত্র দিয়ে তাঁকে স্থির করতে হয়। পৃথক পৃথক ভাবে ইলেকট্রন কণিকাই হোক বা তরঙ্গই হোক সম্ভাবনার সূত্র প্রয়োগে এতে কোন অসুবিধা হয় না। আধুনিক পদার্থবিদ তাই সব কিছুকে 'সম্ভাবনা তরঙ্গে' পরিণত করে খালাস পাচ্ছেন, তার রূপ যে রকমই হোক না কেন তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না।

বার্কী ডেক্সটারের ভাগ্য নির্ধারণে যে সম্ভাবনা কাজ করেছে বিশ্ব প্রকৃতির মূল রহস্যের উদঘাটনেও যে সে সমানে কাজ করছে তাই আমরা দেখলাম। সম্ভাবনার সূত্র ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানের আজ এক পা এগুবারও উপায় নেই। তাই বলে এতে বৈজ্ঞানিক সত্যের ধ্রুবকত্ব লোপ পায়নি, বরং সবগুলো সম্ভাবনাই বিবেচিত হয় বলে এটা দৃঢ়তর হয়েছে।

'সম্ভব' ও 'অসম্ভব' এ দু'টা কথাই আজ বিজ্ঞানের অভিধান থেকে উঠে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে, তার জায়গায় যা এসেছে তা হচ্ছে 'বেশী সম্ভব' আর 'কম সম্ভব'।

১৯৬২

গোলমাল–তত্ত্ব

শহরের বাসিন্দা আপনি। সেই কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠেছেন। তারপর থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের চারটার উপরই শুধু আপনার অধিকার বলবৎ ছিল। কাকের ডাকের অনধিকার প্রবেশের মাধ্যমে আপনার কর্ণেন্দ্রিয় সেই যে আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গিয়েছে তখন থেকে আপনি তার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। ক্যান্টিনে, বাসে, নিউমার্কেটে, এভিনিউতে সবখানে একই অবস্থা। এমন কিছু জিনিষ আপনার কানে বরাবর অনুপ্রবেশ করেছে যা সব সময় ঠিক আপনার কাম্য ছিল না। তবে এদের সবগুলোকে আপনি একইভাবে নেন নি। লাইব্রেরীতে যখনই একটু আধটু শব্দ হয়েছে চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছেন, 'বড্ড গোলমাল'। পরক্ষণেই রেস্তোরায় যখন আড্ডা দিয়েছেন ভুলেই গিয়েছেন যে, আশেপাশে আরো লোকজন আছে। যেন এখানকার পরিবেশ কতইনা শান্ত। অথচ লোকে বলে ঠিক এ জায়গাটিরই গোলমালে ভূতও পালায়। তাহলে গোলমালটা যে আসলে কি সেখানেই ত যত গোলমাল!

পাশের চার্চে 'খ্রীষ্টমাস ডে' উপলক্ষে সাতসকালে অনবরত ঘণ্টাধ্বনি হয়ত আপনার কানে বিরক্তিকর গোলমাল ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু প্রতিবেশী খ্রীষ্টান পরিবারটি সেই ঘণ্টাধ্বনির ভক্তিপ্লুত সঙ্গীতে মুগ্ধ। কাজেই নিঃসন্দেহে গোলমাল জিনিষটি আপেক্ষিক। আপনার কাছে যেটা গোলমাল আমার কাছে সেটা তা নাও হতে পারে। এটা অনেকখানি নির্ভর করে নিজের মন-মেজাজের অবস্থার উপর। তবে কিনা বিজ্ঞানীরা মানুষের মন-মেজাজে বিশ্বাস একটু কম করেন। তাই তাঁরা গোলমালের বাঁধাধরা সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একটু কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছেন। এজন্য তাঁরা একটা মজার কাণ্ড করেছেন। যাবতীয় শব্দকে তাঁরা দু'ভাগে ভাগ করেছেন—একটা হচ্ছে সঙ্গীত (musical sound), আরেকটা হচ্ছে গোলমাল (noise)। অতি সোজা হিসাব। যে সব শব্দ শুনতে খারাপ লাগে না, বেশ তাললয় সম্পন্ন মনে হয় সেগুলো সবই পড়ে সঙ্গীতের আওতায়। আর যে সব শব্দ এলোমেলো, কানে কটু শোনায় তা সবই গোলমাল। বিজ্ঞানীর এই বিভাগটা যে ঠিক বৈজ্ঞানিক হলো না, ঐ কান কথাটার উপস্থিতিই তার প্রমাণ। এক বন্ধুকে জানতাম যার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিরক্তিকর একটা হৈ চৈ ছাড়া

কিছুই নয়। কাজেই বন্ধুটির কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কোন দিনই সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়বে না। যাক, আপাততঃ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটা মেনে নিয়েই এগুনো যাক।

আধুনিক মানুষ অন্তরের বড় দুঃখ থেকেই গোলমালকে সভ্যতার অভিশাপ আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু কলকারখানা, রাস্তায় যান-বাহন আর ঘরে এক একটা করে যান্ত্রিক সরঞ্জাম বাড়ার সাথে সাথে কিছুটা নূতন গোলমালের যে নিত্য আমদানী হচ্চে. এটা সব সময় লক্ষ্য করা হয় না। তবুও গোলমালের প্রতি একটা সহজাত বিতৃষ্ণা বরাবরই মানুষের ছিল। অতীতে অনেককে এর জন্য বেশ সক্রিয় হতেও দেখা গেছে। ১৯৩৩ সনে বৃটেনে লর্ড হোডারকে সভাপতি করে একটা 'গোলমাল বিরোধী সংঘ' (Anti-noise League) গঠন করা হয়। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল, যেসব গোলমালকে অনায়াসে বন্ধ করা যায় তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। দু'বছর পর এই সংঘ কর্তৃক আয়োজিত একটা গোল-মাল নিবারণ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। বহু বড় বড় আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার আর চিকিৎসাবিদ এতে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্যাটা পর্যালোচনা করেন।

এবার দেখা যাক গোলমালকে এরকম ভয় করার পেছনে কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে। সাধারণভাবে সবাই একমত যে, গোলমাল জিনিষটা মানুষের মেজাজ বিগড়ে দিয়ে শান্তি ও কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। মেজাজ, ঘুম ও মনোযোগ এই তিনটা জিনিষের শত্রু যে গোলমাল, সে সম্বন্ধে অল্পই আপত্তি উঠবে। কিন্তু গোলমালে থাকার ফলে স্নায়ুতন্ত্রর স্থায়ী কোন ক্ষতি হয় কিনা, তা বলা মুস্কিল। বিশেষ কয়েক ধরনের অতিরিক্ত গোলমালে অবশ্য কানের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এটা দু'রকমের হ'তে পারে। কোন ধরনের বিস্ফোরণের ফলে হঠাৎ কানের পর্দায় অতিরিক্ত ধাক্কা লাগলে সেটা স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার জেট ইঞ্জিন, বয়লার বা লোহা-লক্কড়ের কারখানায় ক্রমাগত তীব্র গোলমালের মধ্যে কাজ করতে করতে এক ধরনের বধিরতার সৃষ্টি হতে পারে। শেষোক্ত প্রকার বধিরতা অতি অল্পই দেখা যায়। গোলমালের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের কোনটাই সার্বজনীন নয়। অনেকের কাছে গোলমাল, বিশেষ করে সেটা যখন একটু তালে তালে চলতে থাকে, নাকি কাজে কর্মে বেশ একটু উত্তেজক হিসাবেই কাজ করে। অবশ্য গোলমাল-বিরোধীরা এতে আবার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার প্রশ্ন তুলে বলতে চাইবেন তবে এটা তো গোলমালই হল না। হয়ে গেল সঙ্গীত। শিল্পক্ষেত্রে গোলমালের প্রভাব জানার জন্য বেশ কতকগুলো পরীক্ষাকার্য চালানো হয়েছে। এদের একটাতে কিছু সংখ্যক তাঁতীকে কানে গোলমাল নিবারক

ব্যবহার করতে দিয়ে দেখা গেছে যে, কিছুটা কম গোলমালে কাজ করার দরুন তাদের কার্যক্ষমতা শতকরা আটভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। টাইপিষ্টদের পর পর শব্দকারী ও নীরব টাইপ মেশিন দিয়ে কাজ করিয়ে একই ফল পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে গোলমালের প্রভাব কিছুটা কম বেশী হয়। অনেকের গোলমাল সহ্যক্ষমতা অন্যদের চাইতে বেশী। অনেক কারখানায় শ্রমিকদের এই ক্ষমতা পরীক্ষা করে যথাযোগ্য স্থানে নিয়োগ করা হয়।

গোলমাল সম্বন্ধে আরো কচ্কচানির অবতারণার আগে এত গোলমালের আসল উৎসটা যে কি, তাই দেখা যাক। বলবেন সে আবার নূতন কি? আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় যন্ত্রপাতিই তো গোলমালের এক একটা উৎস; অতি মুখর সভ্য মানুষও এর অন্তর্ভূক্ত। কথাটা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, যন্ত্র হলেই যে গোলমাল হবে এমন কোন কথা নেই। যন্ত্রের ভেতর গোলমালের উৎপত্তিটা ঠিক কোথায় তা জেনে নিতে পারলে কায়দা করে মুখর যন্ত্রকেও নীরব করা যেতে পারে। যন্ত্রের বেশীর ভাগ শব্দই উৎপন্ন হয় চলমান অংশগুলোর ঘর্ষন ও কম্পন থেকে। কোন অংশের গতি যদি অসম হয় অথবা এটা যদি হঠাৎ বেশী বা কম জোরে চলতে থাকে তাহলে বিভিন্ন অংশে এর ফলে যে কম্পন উৎপন্ন হবে, তা-ই বহুগুণে বর্ধিত হয়ে যন্ত্রকে মুখর করে তোলে। অনেক সময় শব্দগুলো বিস্ফোরক প্রকৃতির (Explosive) হয়ে থাকে। মোটর গাড়ীর সিলিণ্ডার আর এক্সষ্ট পাইপে এমনিতরো বিরক্তিকর শব্দ উৎপন্ন হয়ে থাকে। অনেক সময় যন্ত্রে কোন খুঁত হলে তা তার উৎপাদিত বিশেষ ধরনের গোলমাল থেকে চট করে বুঝে নেয়া যায়। ট্রেনের শব্দ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বুঝে নেবেন রেলের নীচে জমিটা সমতল কিনা আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুঝে নেবেন গিয়ারগুলো, জোড়াগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। ট্রেনের বেশীরভাগ শব্দের উৎপত্তি হয় রেলের উপর চাকার উঠানামা থেকে। খুব দ্রুত চলচ্চিত্র নিয়ে দেখা গেছে যে, চাকার সাথে রেলের সংযোগ সব সময় বজায় থাকে না। দ্রুত ছোট ছোট লাফ মেরে এটা এগিয়ে যায়। অতিরিক্ত গোলমাল বিশেষভাবে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ বর্তমান বিমানগুলোর কেবিনে যে পরিমাণ গোলমাল হয় তা এর আর্থিক অগ্রগতিকে অনেকখানি ব্যাহত করে দিচ্ছে। পরস্পর-প্রতিযোগী বিমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারটির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হচ্ছে। তাদের অনেকখানি আয়োজনকে নিয়োজিত হতে হচ্ছে ইঞ্জিনের শব্দ কমাবার, আরো ভাল শব্দনিরোধক কেবিন নির্মাণের প্রচেষ্টায়। যানবাহনে উৎপন্ন গোলমালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

করা হলো। কারণ, আজকের দিনে জনসাধারণের একটা বিশেষ ঝোঁক হচ্ছে যানবাহনের হট্টগোল বন্ধ করার দিকে।

আগেই দেখেছি যে গোলমালের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় কানের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোলমাল মাপার জন্য স্থূলভাবে কানই যথেষ্ট, তবে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিতে গিয়ে আপনার কান আমার কান একমত নাও হতে পারে। কাজেই, নিখুঁতভাবে গোলমালের পরিমাপ নিতে গিয়ে নানা রকমের গোলমাল মীটারের (Noise meter) উদ্ভাবন করতে হয়েছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, গোলমালের পরিমাপ সব সময় এর তীব্রতাকেই (Loudness) বুঝায় না। শব্দটা উচ্চগ্রামের কি নিম্নগ্রামের (high pitch or low pitch) তা জানাও প্রয়োজন। অনেক সময় একই তীব্রতার দুই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শব্দের একটি সুখপ্রদ অথচ অন্যটি তা নাও হতে পারে। শুধু তাই নয়। গোলমাল কথাটার মানেই হচ্ছে হরেক বহরের, হরেক আকারের, নানা ধরনের শব্দের একটা তালগোল পাকানো হৈ চৈ। এর মধ্যে এক একটার এক এক তীব্রতা, এক এক গ্রাম। বিভিন্ন শব্দ-তরঙ্গের আকৃতি, প্রকৃতি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের। এসব কিছুর সংমিশ্রনে যে গোলমাল তৈরী হয় বিশ্লেষণ করে তার খুঁটিনাটি জানা সহজ নয়। ফুরিয়ার সাহেব অাঁক কষে গোলমালের নানা উপাদানগুলোকে পৃথক করার একটি উপায় বাতলে দিয়ে গেছেন। সে সব অবশ্য এখানে আলোচিত হবার জিনিস নয়। এখানে আমরা শুধু গোলমালের সামগ্রিক তীব্রতার উপর আলোচনা করব।

এই তীব্রতা মাপতে যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম ডেসিবেল। সাধারণতঃ ৭০ ডেসিবেলের শব্দকে অতিরিক্ত সোচচার বলে নেয়া যায়। এরপর শব্দ সত্যি সত্যি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য কতটুকু পর্য্যন্ত তীব্রতা কানে সুখপ্রদ হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে শব্দটা কোন গ্রামের তার উপর। পিয়ানোর এক জায়গায় (bass end) এই সীমা ৬০ ডেসিবেল, আরেক জায়গায় (middle C) এটা ১১০ আবার অন্য এক জায়গায় (top octome) ১২০। তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন শব্দের তীব্রতা একনজরে দেখার জন্য পরিচিত কতগুলো শব্দের একটা চার্ট দেয়া হল।

শব্দ	তীব্রতা (ডেসিবেলে)	
কানের সহ্যশক্তির শক্তির সীমা	১৩০	অতি তীব্র
কাছ থেকে বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ	১২০	
কাছ থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনের শব্দ	১০০	
মোটর-গাড়ীর সোচ্চার হর্ণ	৯০	তীব্র
রাস্তার ধারে তারস্বর রেডিও	৮০	
খোলা-জানালা ট্রেনের ভেতর	৭০	
কর্মচঞ্চল রাজপথ বা উচ্চস্বর কথাবার্তা	৬০	স্বল্প তীব্র
সাধারণ একটা মাঝারি অফিস ঘরে	৫০	
অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ মোটর গাড়ীর ভেতর	৪০	
শান্ত সন্ধ্যায় শহরতলীর রাস্তায়	৩০	শান্ত
ফিসফিসানি কথাবার্তা	২০	
শোনা যায় মত শব্দের মধ্যে নিম্নতম	১০	
কানের শ্রুতি সীমা	০	নীরব

খুব একটা হট্টগোলের মধ্যে যাদের মেজাজ খারাপ হয়, স্বভাবতঃই তাদের মনে হয় যেন একটা উৎপাদনে এক আসুরিক শক্তি নিয়োজিত হয়েছে। আসলে যে পরিমাণ শক্তি এ ধরনের শব্দ উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তার সবটুকুই যদি শব্দে রূপান্তরিত হয় তবে এ পৃথিবীতে টেকা মুস্কিল হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ব্যয়িত শক্তির সামান্য একটা অংশই শুধু শব্দে পরিণত হয়। অর্কেষ্ট্রায় জবড়জঙ্গ যন্ত্রচালিত অর্গান পাইপগুলো বাজাতে ১০,০০০ ওয়াটের মোটর দরকার হয়! কিন্তু এর থেকে শব্দ শক্তি উৎপন্ন হয় মাত্র ১৩ ওয়াটের। পিয়ানো বাজিয়ে মানুষ শক্তি খরচ করে ২০০ ওয়াটের মত, কিন্তু শব্দ বের হয় মাত্র ০·৪ ওয়াটের। বড় গোলমালের ভেতর গিয়ে পড়লে ছোট গোলমাল তলিয়ে যায়, এটা একটা জানা কথা। দু'টা গোলমাল যদি মোটামুটি একই গ্রামের হয় তবে একটা চাপা পড়ার জন্য দু'য়ের তীব্রতার মধ্যে অন্ততঃ ১২ ডেসিবেল তফাত থাকতে হবে। গোলমাল দু'টা যদি বিভিন্ন

গ্রামের হয় তবে এ তফাত আরো বেশী হতে হবে। দু'ফুট দূরে সিংহের গর্জন বয়লার ফ্যাক্টরীর ভেতর শুনা যাবে না। কিন্তু সরব রাজপথেও এটা যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারে।

নানা ধরনের গোলমালের কথা বলতে গিয়ে একটা জিনিস খেয়াল করতে হয়। এই পৃথিবীতে যত গোলমাল তার অতি সামান্য একটা অংশই শুধু আমাদের কানে ধরা পড়ে। আমাদের কান এমন ভাবে তৈরী যে এতে কোন শব্দ শুনতে হলে তার গ্রাম একটা বিশেষ সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এর চাইতে উচ্চ বা নিম্ন গ্রামের শব্দ কানে ধরা পড়বে না, তা সে যতই তীব্র হোকনা কেন। এটাকে একটা বিরাট আশীর্বাদই বলতে হয়। সাধারণ শ্রবণ সীমার মধ্যে যত গোলমাল আছে তার জ্বালাতেই আমরা অস্থির। এর উপর সব মাপের শব্দ যদি কানে সাড়া জাগাত তাহলে আর রক্ষা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাদুড়, পোকা-মাকড় প্রভৃতি এমন সব শব্দ নিজেদের প্রয়োজনে করে যা আমাদের শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে। তা না হলে দুপুর রাতের আপাতঃ নীরবতাতেও নানা ধরনের গোলমালে অতিষ্ঠ হতে হতো

এ তো গেল গোলমালের নানান কথা। আসলে যেটা সবচাইতে জরুরী সেই গোলমাল থেকে বাঁচার উপায়গুলো কি কি এবার দেখা যাক। কয়েক রকমে কাজটা হতে পারে।

(১) গোলমালের উৎসই যাতে না থাকতে পারে এজন্য যন্ত্রপাতিকে নীরব প্রকৃতির করা যেতে পারে। আজকাল বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরী করার সময় এদিকটার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া হচ্ছে।

(২) শব্দ যদি নেহাত হয়ই, তবে সে শব্দের গতিপথের দিক সুবিধামত বদলিয়ে দেয়া যেতে পারে।

(৩) উৎস ও কানের মধ্যে কোথাও দেয়াল প্রভৃতি দিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(৪) এসবেস্টস, পশম প্রভৃতি শব্দ-শোষক বস্তু দিয়ে দেয়াল ও ছাদ তৈরী করে গোলমাল বেশ কিছু কমানো যেতে পারে।

(৫) কানে ear-plug প্রভৃতি শব্দ-নিরোধক জিনিষ ব্যবহার করে বাইরের গোলমালের প্রতি নির্লিপ্ত থাকা যেতে পারে।

এতসব উপায় থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনে গোলমালের পরিমাণ বাড়ছে বৈ কমছে না। বিশেষ করে নাগরিক জীবনে ক্রমবর্ধমান গোলমালকে নিয়ন্ত্রণে

রাখার জন্য আইনকেও সক্রিয় হতে হয়েছে। অনেকগুলো গোলমালকেই আদালত আইন করে বন্ধ করেছে। যেমন মোটর গাড়ীর এক্সষ্ট-পাইপ সাইলেন্সার না লাগালে Motor Car (excessive noise) Regulations-এর আওতায় পড়তে হয়। আমাদের দেশে এই ব্যাপারে আইন তত সক্রিয় না হলেও ইংলণ্ডের আইনে যে কোন গোলমালই দণ্ডনীয় 'Nuisance'-এর পর্যায়ে পড়ে যদি সেটা 'অস্বাভাবিক' এবং 'অযৌক্তিক' হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আবার এই ব্যাপারে আইনের কড়াকড়ি কিছুটা কম। যেখানকার অনেকগুলো শহরই বেশকিছু গোলমালকে আইনতঃ সিদ্ধ করে নিয়ে আইন পাশ করিয়েছে। সেখানে গোলমালের এবং তৎকর্তৃক সৃষ্ট অপরাধের পরিমাপ করার জন্য প্রত্যেক ষ্টেটের আলাদা মাপন পদ্ধতি রয়েছে। শ্রবণশক্তি শতকরা কতভাগ নষ্ট হয়েছে সেই হিসাবে বিভিন্ন হারে আদালত জরিমানা আরোপ করে থাকে।

গোলমাল সম্বন্ধে গোলমেলে কচ্‌কচানি আদালত পর্যন্ত টেনেই শেষ করা যাক। কারণ, এ-সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৯৬৪

জীবতাত্ত্বিক চিহ্নের ইতিকথা

কিছুদিন আগে বিখ্যাত সাপ্তাহিক Time-এর প্রচ্ছদে একটি বিশেষ ধরনের প্রচ্ছদ সবাইকে একটু অবাক করেছিল। বিশ্বের কোন নামজাদা ব্যক্তিকে নিয়ে প্রচ্ছদ করার বদলে সেবার পত্রিকাটি জন্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই সে সম্মান দিয়েছিল। সেই প্রচ্ছদে ছিল অসংখ্য নানা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বটিকা, একটি বিশেষ চিত্রের আকারে সাজিয়ে দেয়া। জীব-তত্ত্বের যে কোন ছাত্রের কাছেই এই চিহ্ন স্ত্রী-জাতীয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। মজার ব্যাপার হলো, পাশের চিত্রে প্রদর্শিত এই স্ত্রী-জাতীয় চিহ্নটি দেখে জনৈক পাঠিকার একে শিশুর খেলনা ঝুমঝুমি বলে মনে হয়েছিল। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের একেবারে বিপরীত ব্যাপার আর কি।

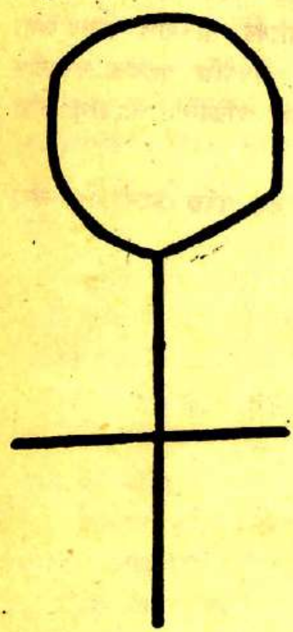

স্ত্রী-জাতীয় চিহ্ন

এখন কথা হচ্ছে, ঝুমঝুমিই হোক আর যাই হোক, ঠিক এই চিহ্নটাকেই কেন স্ত্রী-জাতীয় চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়? খামখেয়ালী করে এই চিহ্নের উৎপত্তি হয়নি। এর পেছনে দীর্ঘ জটিল ইতিহাস রয়েছে। আর এই ইতিহাসের সূত্র ধরে পেছনের দিকে চলে গেলে আমরা দেখব কিভাবে এক জায়গায় গিয়ে জীব-বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আলকেমী, ভূ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র আর পৌরাণিক কাহিনী মিলে একাকার হয়ে গেছে। জীব-বিজ্ঞানে শুধু স্ত্রী-জাতীয় চিহ্নই নেই, পুরুষ জাতীয় চিহ্নও আছে। পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে প্রদর্শিত এই পুরুষ জাতীয় চিহ্নেরও এইরূপ ইতিহাস আছে। মানুষ যেদিন লক্ষ্য করলো যে আকাশে জ্যোতিষ্ক সমূহের চলাফেরার সাথে পৃথিবীর নানা ঘটনার একটা নিয়মিত সম্পর্ক আছে, সেদিন

থেকে সে জ্যোতির্বিদ্যায় আকৃষ্ট হলো। বিশেষ করে সূর্যের সাথে গাছপালার বৃদ্ধি ও গৃহপালিত পশুর বংশ বিস্তার এবং চাঁদের সাথে জোয়ার-ভাঁটার সম্পর্ক থেকে সে চমৎকৃত হয়ে পড়ে। এসব সম্পর্ক দেখে সে স্বাভাবিক ভাবেই আরো কতগুলো মনগড়া সম্পর্ক বানিয়ে নিয়ে তার উপর দৃঢ় আস্থা রাখতে লাগল। কোন একজন মানুষ বা কোন পরিবার বা জাতির উপর চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের নানা কাল্পনিক প্রভাব তারা 'আবিষ্কার' করে বসল। এভাবে তাদের বদ্ধমূল ধারণা হলো গ্রহাদির চলাফেরার ধরন-ধারণ লক্ষ্য করে পার্থিব নানা ঘটনার কথা আগাম বলে দেওয়া সম্ভব। জ্যোতিষশাস্ত্র হচ্ছে এই ধারণারই নিয়মবদ্ধ কেতাবী রূপ। প্রাচীনযুগে ব্যাবিলনবাসীদের হাতে এই শাস্ত্র এর উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। প্রাচীন শিলালিপিতে দেখা যায় নানা দেব দেবতার নাম এবং বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের নাম এক ও অভিন্ন।

পুরুষ-জাতীয় চিহ্ন

খৃষ্টপূর্ব ৩৩১ সনে আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের ফলে এই সব বিদ্যা প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীরা জানতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র এভাবে দূর ও নিকটের ঘটনাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করায় এবং কতকগুলো হস্তশিল্প বিশেষ করে ধাতুশিল্পের সাথে নানা দেব-দেবীর নাম ও ধর্মীয় আচার জড়িয়ে থাকায় ধীরে ধীরে কোন কোন ধাতু এক একটা বিশেষ গ্রহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে।

এভাবে সবচেয়ে মূল্যবান যে ধাতু সোনা তার সাথে সূর্যের সম্পর্ক ঘটে। লোহা এর চেয়ে শক্ত বটে কিন্তু মরচে ধরে লাল হয়ে যায় বলে এর সম্পর্ক ঘটল লালচে মঙ্গল গ্রহের সাথে। একই ভাবে স্বল্পদামী তামার মিল পাওয়া গেল শুক্র গ্রহের সাথে। এভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে আলকেমী হয়ে একের পর এক রূপান্তরের মাধ্যমে রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যার সাথে এ সমন্বয় ঘটল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে। আধুনিক নিয়মবদ্ধ জীব-বিজ্ঞানের জনক কার্ললিনিয়াস সে সময়ে স্কুলে জগাখিচুড়ী বিজ্ঞানেরই পাঠ নিচ্ছিলেন।

বর্তমানে রসায়ন শাস্ত্রে কোন ধাতুর নাম লিখতে হলে তাকে তার ল্যাটিন গ্রীক নামের আদ্যাক্ষর বা প্রথম দু'টা অক্ষর দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে।

এভাবে সোনার চিহ্ন Au এসেছে Aurum থেকে, রূপার চিহ্ন Ag এসেছে Argentum থেকে, লোহা Fe Ferrum থেকে। এই লিখন পদ্ধতি ১৮১৪ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস প্রথম উদ্ভাবন করেন।

এ রকম কোন সহজ পদ্ধতি জানা ছিলনা বলে মধ্যযুগীয় আলকেমিষ্টরা তখনকার দিনে জ্যোতিষীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্রহের চিহ্নগুলোকে এক একটা ধাতু বোঝাতে ব্যবহার করতেন। এ ভাবে বর্তমান জীব-বিজ্ঞানের পুরুষ জাতীয় চিহ্নকে তারা মঙ্গল গ্রহ ও লোহা বুঝাতে এবং স্ত্রী-জাতীয় চিহ্নকে শুক্রগ্রহ ও তামা বোঝাতে ব্যবহার করত। একই কারণে পরবর্তীকালে লিনিয়াস এর কয়েকটা চিহ্নকে জীব-বিজ্ঞানে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। ১৭৫৩ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Specis Plantarum-এ এসব চিহ্নের প্রথম জীব-তাত্ত্বিক ব্যবহার দেখা যায়। লিনিয়াস শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও সূর্যে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় চিহ্নগুলোকে যথাক্রমে শক্ত, লতানো, চিরস্থায়ী, দ্বিবার্ষিক ও বার্ষিক উদ্ভিদ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন; আর বুধ, মঙ্গল, ভেনাসের চিহ্নগুলোকে যথাক্রমে উভ-লিঙ্গ, পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। আমরা দেখি যে দ্বি-বার্ষিক ও পুরুষ জাতীয় বোঝাতে একই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। পুরুষ, স্ত্রী ও উভ-লিঙ্গ ফুল বোঝাতে লিনিয়াস তাঁর চিহ্নগুলো বহুবার ব্যবহার করেছেন। এ চিহ্নগুলোর সারল্যের জন্য প্রাণী-বিজ্ঞানে এদের সাধারণভাবে মেনে নেয়া হয়েছে।

সূর্য

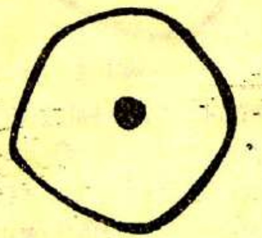

সূর্য

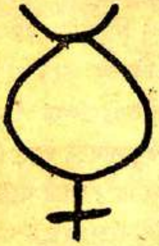

বুধ

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তার্তে কিভাবে এই চিহ্নগুলো জ্যোতিষ শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, আলকেমীর হাত বদলিয়ে জীব-বিজ্ঞানের হাতে এসে পড়েছে তাই শুধু বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই চিহ্নগুলোর আসল উৎপত্তি যে ঠিক কোথায় তা নিয়ে বহুদিন ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ চলছে। এক সময় কেউ কেউ বলতেন, ভেনাসের (শুক্রগ্রহের ল্যাটিন নাম ভেনাস, গ্রীক পুরাণের একজন দেবী) আয়নার আকৃতিতেই স্ত্রী-জাতীয় চিহ্নের এবং মার্সের (মঙ্গল গ্রহের ল্যাটিন নাম মার্স, একজন গ্রীক

দেবতা) বর্শা ও ঢাল থেকে পুরুষ জাতীয় চিহ্নের উৎপত্তি। এসব মত বহু আগেই অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে মধ্যযুগীয় ফরাসী পণ্ডিত ক্লড-এর মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর মতে এসব চিহ্ন এবং শনি, বুধ ও বৃহস্পতি প্রভৃতির চিহ্ন এদের গ্রীক নামের প্রথম অক্ষর হতে উদ্ভূত হয়েছে। এভাবে গ্রহগুলোর গ্রীক নাম ক্রনোস (শনি), জিউস (বৃহস্পতি), থুরস (মঙ্গল), ফসফরাস (শুক্র) এবং ষ্টিলবন (বুধ) থেকে চিহ্নগুলোর উৎপত্তি।

মুদ্রণ শিল্পের আগে গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরগুলো এক এক সময় এক এক রকমের ছিল। একই দলিলে একই অক্ষরের বিভিন্ন রূপও অনেক সময় দেখা গিয়েছে। কিন্তু এ ভাবে যে সব চিহ্নের উৎপত্তি হয়েছে তার মধ্যে অন্ততঃ দু'টার (মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের) আজ বিশ্বজোড়া সার্বজনীন ব্যবহার হচ্ছে, যেরকম ব্যাপক ব্যবহার চিহ্নগুলোর দীর্ঘ ইতিহাসে আর কখনো হয় নি। হতে পারে এসব চিহ্নের ঐতিহাসিক অর্থ থেকে ভিন্ন এক অর্থে এরা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু যে ভাবে পর্যায়ক্রমে অর্থের এই রূপান্তর ঘটেছে, বিজ্ঞানের পুরাণ ও ইতিহাসের সাথে তা ঠিক ভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছে।

১৯৬৭

আপেল তবু পড়ে

গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে নিউটনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এ আপেল নীচের দিকে পড়ে কেন? সে প্রশ্নের জবাব নিউটন খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মধ্যে। কয়েক শ' বছর পর আইনষ্টাইন খুঁজে পেয়েছিলেন আপেক্ষিকতার সাধারণ সূত্রে (General Theory of Relativity), আর তারও অনেক পরে, এই সেইদিন, ফ্রেড হয়লে এবং নারলিকার আবার নতুন করে সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের নব আবিষ্কৃত তত্ত্বের মধ্যে। এর মানে কি এই যে হয়লে আর নারলিকার—নিউটন ও আইনষ্টাইনকে ভুল প্রমাণিত করেছেন? তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মতবাদগুলো পাল্টিয়ে দিয়েছেন? মোটেই না। বরং নিউটন ও আইনষ্টাইনের পটভূমিকাতেই এ নূতন তত্ত্ব বোঝা সম্ভব।

হয়লে-নারলিকারের আসল থিউরীটা অতিমাত্রায় গণিতনির্ভর। গণিতকে বাদ দিয়ে এ সম্পর্কে দু একটা কথাই শুধু বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নিউটন ও আইনষ্টাইনের মতবাদগুলো আবার স্মরণ করা যাক। নিউটনের মতে যেকোন দু'টি বস্তু-কণা একে অপরকে আকর্ষণ করে। কণা দুটোর ভর আর তাদের মধ্যেকার দূরত্বের উপর এ আকর্ষণের জোর নির্ভর করে। কিন্তু এতে প্রশ্ন উঠে, কি করে হাজার হাজার মাইল ব্যবধানে দু'টি বস্তু-কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করতে পারে? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ দু'টি জিনিষকে আগে-ভাগেই মেনে নেয়, তা হচ্ছে দূরবর্তী বস্তুর উপরও ক্রিয়া (action at a distance) সম্ভব আর এই ক্রিয়া হতে কোন সময়ের দরকার হবে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিদ্যুত-চুম্বক তত্ত্বের আলোকে এই দূরবর্তী বস্তুর উপর এই তাৎক্ষণিক (Spontaneous) ক্রিয়া কিন্তু বেশ কিছু গোলমাল বাধিয়ে তুলল। বিদ্যুত্-চুম্বক বিকিরণ মাত্রেরই কোন দূরত্ব ভ্রমণ করতে কিছুটা সময়ের দরকার হয়, সে যত সামান্যই হোক না কেন। এ বিকিরণ তাৎক্ষণিক নয়, আলোর গতিতে এটা চলে। কাজেই নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণকে বিদ্যুত-চুম্বক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে "শক্তির ক্ষেত্রে"(Fields of Force) ধারণা প্রচলিত হয়। এর মতে দু'টা বিদ্যুত-আয়নিত কণা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে সরাসরি ভাবে নয়। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মাধ্যমেই। অনুরূপ-ভাবে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্র থাকে। যেমন সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্র সূর্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তবে বিদ্যুত-চুম্বক ক্ষেত্রের সাথে এই মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়ে গেছে। বস্তু-কণার উপর বৈদ্যুতিক চার্জের প্রকৃতি হিসেবে বিদ্যুত-চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি ও ধ্বংস করা যেতে পারে। যেমন ধনাত্মক চার্জের ক্ষেত্রকে ঋণাত্মক চার্জের ক্ষেত্র দিয়ে বিনষ্ট করে দেয়া যেতে পারে। অপরপক্ষে মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রের উপর আমাদের কোন হাত নেই। এটা অব্যয়, অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়। আইনষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এই ব্যাপার-টিকে স্থান-কালের (space-time) ধারণার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমরা সব সময় ত্রি-মাত্রিক (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) জগতের সাথেই পরিচিত। আইনষ্টাইন বল্লেন, এ তিন মাত্রা থেকে সময়কে পৃথক করা যায় না। কাজেই এর সাথে একটা চতুর্থ মাত্রা যোগ করতে হল—সময়। আমাদের এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এই চতুর্মাত্রিক মহাশূন্যেই বিরাজ করছে। আইনষ্টাইনের মতে মাধ্যাকর্ষণ এই স্থান-কালে গড়া এই মহাশূন্যেরই একটা বিশেষ গুণ আর এ কারণেই এটা চির বিরাজমান।

নিউটন ও আইনষ্টাইনের থিওরীতে বিশ্বে নূতন বস্তু সৃষ্টি হলে বা এর থেকে কিছু বস্তু ধ্বংস হলে মাধ্যাকর্ষণের (G) উপর এর কোন প্রভাব দেখা যাবে না। কিন্তু হয়লের মতে হঠাৎ যদি কোন কারণে বিশ্বের বস্তুপুঞ্জের অর্ধেক উবে যায়, তবে G এর মানও হয়ে পড়বে বর্তমানের দ্বিগুণ। এই নূতন থিউরীর একটা ফল হলো যে এখন মনে করতে হবে মাধ্যাকর্ষণের জোর নির্ভর করে সারা বিশ্বের বস্তু-পুঞ্জের ঘনত্বের উপর। আর যেহেতু নূতন থিওরীতে মাধ্যাকর্ষণ মাত্রই পৃথিবীর সব বস্তু-কণার প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত। সুতরাং আর কোন বস্তু-কণাই যদি না থাকে তবে মাধ্যাকর্ষণ বলেও কিছু থাকবেনা। নূতন থিওরীর অন্যতম আবিষ্কর্তা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক নারলিকারের মতে 'বিশ্বে বস্তু-কণা সংখ্যা যদি দু'য়ের কম হত তবে পদার্থ-বিদ্যা বলে কোন বিজ্ঞানই থাকতনা'।

হয়লে-নারলিকার থিওরী ইংলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান রয়েল সোসাইটির কাছে পেশ করা হয়েছে। সবাই যে এই থিওরী এক বাক্যে

মেনে নিয়েছে তা নয়। রয়েল সোসাইটিতে বেশ ক'জন সমালোচনাকারী রয়েছেন। অবশ্য পৃথিবীর এই প্রাচীনতম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তিনশ' বছর আগে যেদিন এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেণ্টের মূল থিওরীটি শুনছিল তখনো এতে সমালোচনাকারীর অভাব ছিল না।

সুন্দর একটা উপমা দিয়ে নিউটন ও আইনষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে তফাতটুকু বোঝানো যেতে পারে। উঁচু এক দালানের সামনে কয়েকটা ছেলে মার্বেল খেলছে। নিউটন সেই দালানের পাঁচতলার এক জানালা থেকে এ খেলা দেখছেন। মার্বেলগুলো কেন যে গড়িয়ে গিয়ে একে অপরের উপর গিয়ে পড়ছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে, এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। অপরপক্ষে আইনষ্টাইন খেলাটা দেখছেন নীচের তলায় এর ঠিক সামনে বসেই। তিনি দেখছেন যে জিনিষটা ঠিক সমতল নয় বলেই মার্বেল-গুলো জমির উঁচু-নিচতা অনুসারে এদিক-ওদিক গিয়ে একে অপরের গায়ে ঠোকর খাচ্ছে; আকর্ষণ বিকর্ষণ কথাগুলো আসলে ফাঁকি। প্রায় ক্ষেত্রেই দু'টা ব্যাখ্যাতেই আমাদের কাজ চলে যায়। তবে মনে হয় আইনষ্টাইনের ব্যাখ্যাটা সত্যের বেশী কাছাকাছি।

হয়লে-নারলিকারের থিওরী কিন্তু 'দূরবর্তী বস্তুর উপর ক্রিয়ার' (action at a distance) ধারণাটাই আবার ফিরিয়ে এনেছে, তবে আরো একটু নিখুঁত কায়দায়। আমরা দেখেছি দূরবর্তী বস্তুর উপর তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার ধারণা কেমন ভাবে গোলমাল বাধিয়ে তোলে। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে হয়লে যে দু'টা বস্তু-কণার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ আলোচিত হচ্ছে তাদের ছাড়াও এদের উপর বিশ্বের অন্যান্য সব বস্তু-কণার প্রভাবের কথা চিন্তা করলেন। ফলে আকর্ষণটা ঠিক দু'টা বস্তু-কণার মধ্যে না হয়ে হল একটা বস্তু-কণা ও বাকী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। এদ্দিন কোন বস্তু-কণার ভরকে (mass). তার অন্তর্নিহিত গুণ বলে মনে করা হত। কিন্তু হয়লে থিওরীর মধ্যে এটা উদ্ভূত হয় বিশ্বের অন্যান্য সব বস্তু-কণার কল্যাণেই। এখানটিতেই আইনষ্টাইনের সঙ্গে হয়লের আসল তফাত। আইনষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ যেমন স্থান-কালের একটা জ্যামিতিক গুণ তেমনি হয়লের মাধ্যাকর্ষণ সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরই একটা সামগ্রিক গুণ।

প্রশ্ন উঠতে পারে হয়লে-নারলিকার থিওরীর সরাসরি কোন প্রয়োগ বর্তমানে সম্ভব কিনা। তত্ত্বগত সুবিধা ছাড়া পূর্ববর্তী থিওরীগুলোর চাইতে এর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা যায় কিনা। হয়লের মতে এই নূতন থিওরী মাধ্যাকর্ষণ ও

বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার একীভূতকরণের কাজ আরো সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তা ছাড়া বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে হয়লের যে "ক্রমাগত সৃষ্টি"র (continuous creation) থিওরী রয়েছে, এটা তাতেও যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে মনে হয়। একটি মহাবিস্ফোরণের (Big bang) মাধ্যমে বিশ্বের জন্ম—এই মর্মে এর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী থিওরী রয়েছে।

সব থিওরীর, সব কচ্‌কচানির পরেও আপেল যুগ যুগ ধরে নীচের দিকেই পড়বে। শুধু এই সম্পর্কে চিন্তা করে মানুষ নিজের জ্ঞানের পরিধি ক্রমে বাড়াতে থাকবে। এটুকুই আমাদের লাভ।

১৯৬৪

সাত রঙে রাঙা

ছোট্ট একটা প্রিজম সহযোগে সাদামাটা পরিবেশ যখন মুহূর্তে নানা রঙে রঙীন হয়ে ওঠে, সেটি নিশ্চয়ই বিজ্ঞানে হাতে খড়ি নেয়া যে কোন শিশুর জন্য অতি আনন্দের মুহূর্ত। দিনের পর দিন শিশু প্রিজম থেকে সাত রঙের ছটা নানা জায়গায় ফেলতে দেখলে আশ্চর্য হবো না। কিন্তু সূত্রের অপর প্রান্তে চশমা আটা সেই 'বুড়ো' বিজ্ঞানী তিনিও অহরহ তাকিয়ে থাকেন এই বর্ণালীর দিকে। তবে রঙের খেলার আনন্দের জন্য নয়। কখনো জানবার জন্য অণু বা পরমাণুটা ঠিক কিভাবে তৈরী, অথবা অতি দূরের তারাটায় কি কি বস্তু রয়েছে আবার কখনো বা জানতে চুমকি-খচা এই মহাকাশে কোন্ বেয়াড়া চুমকিটি কোন দিকে ছুটে পালাচ্ছে। হ্যাঁ সব খবর সামনে রাখা সেই বর্ণালী থেকেই।

বিজ্ঞানের অনেক বড় বড় জিনিষের শুরু যেমন নিউটন থেকে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। শুরুটা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যাক্।

"সেটা ছিল ১৬৬৬ সাল। এ সময় নানা আকৃতির কাঁচের লেন্স নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। একটা ত্রিকোণ "প্রিজম" জোগাড় করে তা দিয়ে রঙের সুপরিচিত গুণাগুণ পরীক্ষা করছিলাম। কামরাটা পুরোপুরি আঁধার ভরে শুধু জানালায় ছোট্ট একটা ছিদ্র রাখলাম যাতে আলো প্রতিসরিত হয়ে বিপরীত দিকের পর্দায় গিয়ে পড়তে পারে। এই উজ্জ্বল ঘন রঙের শোভা দেখতে বড় পুলক অনুভব করলাম।" এত সাদাসিদেভাবে যার শুরুটা তাই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক দিকগুলোতে জটিলতম সমস্যাগুলোর সমাধানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ধরে নেয়া যাক যে বর্ণালী সৃষ্টি করার নিউটনীয় কায়দাটি আমাদের জানা। কারণ স্কুলে গোড়ার দিকেই শিখিয়ে দেয়া হয় যে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের আলো প্রিজমের ভেতর বিভিন্ন রকম বাঁকে বলেই সাদা আলো সাত রঙা আলোতে বিশ্লিষ্ট হয়। কিন্তু এভাবে তৈরী বর্ণালী বিজ্ঞানীর কাছে ঠিক যুতসই মনে হলো না। নিউটনের বেশ কিছু পরে আলোর তরঙ্গ-প্রকৃতি আবিষ্কার হয়। এর তরঙ্গ-প্রকৃতি থেকে আলোর নূতন একটি ধর্ম প্রকাশ পেল তা হলো অপসরণ বা diffraction। এটা হলো কোন সরু ফাঁকের মধ্য

দিয়ে যাবার সময়ে আলো ঠিক জ্যামিতিক সরলরেখায় যাবেনা, যার ফলে সামনে রাখা পর্দায় ঠিক জ্যামিতিক আলো ও ছায়া ক্রমবিন্যস্ত দেখা যাবে। কার্যক্ষেত্রে এ ধরনের অসংখ্য ফাঁকের যে সমন্বয় ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় 'গ্রেটিং'। কাঁচের উপর খুব সূক্ষ্ম হীরা দিয়ে দাগকাটা। পর পর দু'টো দাগের মাঝখানে স্বচ্ছ অংশটুকু এক একটা ফাঁকের কাজ করে। যে সব গ্রেটিং সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় তাতে এক ইঞ্চির মধ্যেই দাগের সংখ্যা হয় পনের হাজারের মত। তা হলে বুঝে দেখতে পারেন কত সরু এর একটা ফাঁক। অপসরণের যে গুণটি আমাদের দরকার তা হলো বিভিন্ন রঙের অর্থাৎ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো এতে বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকে। ফলে প্রিজমের মতো এক্ষেত্রেও আমরা বর্ণালী দেখতে পাই এবং আরো ভালোভাবেই দেখতে পাই। কোন্ আলো কতটুকু বেঁকে বর্ণালীর কোন্ অংশে পড়বে তা নির্ভর করছে প্রথমতঃ তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর, দ্বিতীয়তঃ ফাঁকগুলোর সরুত্বের উপর। এই দুইয়ের যে কোন একটা জানা থাকলে বাঁকানোর পরিমাণ থেকে আমরা অন্যটা বের করতে পারি। 'গ্রেটিং'-এর নির্মাতা যদি বলে দেয় এর এক ইঞ্চিতে ক'টা দাগ আছে তা হলে কোন্ আলোর বর্ণালীর কোন অংশে পড়েছে অর্থাৎ কতটুকু বেঁকেছে তা থেকে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য জানা যাবে। এভাবে বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নানা ধরনের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য জানার জন্য তার বর্ণালী ব্যবহৃত হয়েছে।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ছোট হয় 'গ্রেটিং'-এর ফাঁকগুলো ততই ছোট হওয়া দরকার। দৃশ্য আলোর আওতা ছেড়ে আরো ছোট এক্সরের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যদি আমরা জানতে চাই তা হলে যে সূক্ষ্ম 'গ্রেটিং'-এর দরকার হবে তা যান্ত্রিক উপায়ে তৈরী সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানীরা হাল ছাড়লেন না। তাঁরা দেখলেন স্বয়ং প্রকৃতিই এর জন্য দরকারী গ্রেটিং তৈরী করে দিয়েছে। ক্রীষ্টাল অর্থাৎ স্ফটিকের আকারে যেসব পদার্থ রয়েছে তাতে অণুগুলো একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ণে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। স্তরগুলোর মধ্যে যে ফাঁক তাও আণবিক পরিমাণেরই। কাজেই বিজ্ঞানীরা এই ফাঁকগুলোকেই 'গ্রেটিং' হিসেবে ব্যবহার করলেন, এক্সরের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপার জন্য। আবার উল্টোটাও হয়েছে। জানা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এক্সরে নিয়ে পরীক্ষা করে কোন বিশেষ ক্রীষ্টালের বিন্যাস-পদ্ধতি বিশেষভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। এ সব কিছুই বর্ণালী বিশ্লেষণের কল্যাণে।

উজ্জ্বলকৃত কোন গ্যাসের বর্ণালী যখন নেয়া হয়, তখন লাল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি রঙ প্রশস্ত ব্যাণ্ডের আকারে না পড়ে আলাদা আলাদা সরু লাইনের আকারে দেখা দেয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এক একটা গ্যাসের জন্য, আরো

সঠিকভাবে বলতে গেলে এক একটা মৌলিক পদার্থের জন্য এই লাইনগুলোর বন্টন, উজ্জ্বলতা, রঙ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন সোডিয়াম বাষ্পের জন্য খুব কাছাকাছি দু'টো হলদে লাইন দেখতে পাওয়া যায়। আবার পটাসিয়াম বাষ্পের জন্য বেশ কটা লাইনই দেখা যায়, যার মধ্যে একটা লাল ও একটা বেগুনী লাইন খুব উজ্জ্বল হয়। তখন সাধারণ লবণকে আগুনে পুড়ে তার বর্ণালী যদি নেওয়া হয়, আমরা পরিষ্কার দেখতে পাবো তাতে রয়েছে খুব কাছাকাছি দু'টো উজ্জ্বল হলদে লাইন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সাধারণ লবণে সোডিয়াম রয়েছে (এর রাসায়নিক নাম 'সোডিয়াম ক্লোরাইড')। এমনি করে যে কোন বস্তুর মৌলিক উপাদানগুলো তার বর্ণালী-বিশ্লেষণ থেকে জানা সম্ভব।

পদার্থের এই নূতন বিশ্লেষণ-পদ্ধতির মস্ত বড় কয়েকটা সুবিধা রয়েছে। প্রথমতঃ এরজন্য পদার্থটির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হলেও চলবে। অথচ রাসায়নিক বা অন্য কোন বিশ্লেষণ এত অল্প জিনিষ দিয়ে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্লেষণের জন্য জিনিষটার আদৌ দরকার হচ্ছেনা। দরকার হচ্ছে তার থেকে আসা আলোর, আর সেটা জিনিষটা থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে বসেও পাওয়া সম্ভব। যেমন সূর্যের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এতে কি কি মৌলিক উপাদান রয়েছে তা জানা গেছে। শুধু তাই নয়, সুদূর মহাকাশ থেকে আসা যে তারাটির সামান্যতম আলো আমরা পাই তার বর্ণালী থেকে সে তারার ভেতরের খবর অনেকখানি জেনে নেয়া সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় এর ফলে পৃথিবীতেই নূতন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার ঘটেছে। এমনিভাবে সূর্যের আলোর বর্ণালী পরীক্ষার সময় দেখা গেল যে এতে এমন একটা লাইন পাওয়া যায় যার সাথে পৃথিবীর জানা কোন বস্তুর লাইনই খাপ খাচ্ছেনা। অথচ পৃথিবী সূর্য থেকে এসেছে, কাজেই সূর্যে যা আছে পৃথিবীতেও তা থাকা দরকার। শুরু হল খোঁজাখুঁজি, যার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটা নূতন গ্যাসই আবিষ্কার হয়ে পড়ল, যার নাম দেয়া হল 'হিলিয়াম' (বলাবাহুল্য 'হিলিও' কথাটার অর্থ সূর্য)। এমনিভাবে বেশ কয়েকটা আবিষ্কারই ঘটেছে বর্ণালী বিশ্লেষণের কল্যাণে।

মহাকাশের কথাই যখন হচ্ছিল, আরো একটি মজার ব্যাপার বলে ফেলা যাক। ডপলার সাহেব দেখিয়েছিলেন যে কোন তরঙ্গের উৎস যখন কারো কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন তার থেকে আসা বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য স্বাভাবিকের চেয়ে (স্থির উৎসের তরঙ্গের চেয়ে) বড় হয়ে যায়; আবার উৎস

যখন পরীক্ষকের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তখন এর উল্টোটা ঘটে, এর দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায়। এই কারণেই ষ্টেশনে দাঁড়ানো ব্যক্তির কাছে বাঁশী বাজাতে বাজাতে ষ্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে এমনি একটা ট্রেনের বাঁশী অপেক্ষাকৃত নিম্নখাদ এবং তার দিকে আসছে এমন ট্রেনের বাঁশী অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ বলে মনে হয়। একই ব্যাপার আলোকি-তরঙ্গের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে উৎসের গতি আলোর গতির তুলনায় অত্যন্ত অল্প বলে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝা যাবেনা। উচ্চ গতিসম্পন্ন উৎস থেকে আসা আলোর বর্ণালীতে লাইনগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে লালের দিকে অর্থাৎ দীর্ঘতর তরঙ্গের দিকে সরে আসবে যদি উৎস পরীক্ষককে ছাড়িয়ে চলে যায় আর বেগুনীর দিকে সরবে যদি এটা পরীক্ষকের দিকে এগুতে থাকে। বর্ণালী সরবার দিক ও পরিমাণ লক্ষ্য করে উৎসের গতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এভাবে আকাশের বিভিন্ন বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর কোন কোনটা সেকেণ্ডে কয়েক শ' মাইল বেগে এগিয়ে আসছে আবার বহু দূরের অনেকগুলো তারা সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইলের প্রচণ্ড গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। এতে বিরাট ব্যাপার-স্যাপারের সব খবর এনে দিচ্ছে টেবিলের উপর রাখা কয়েক ইঞ্চি লম্বা বর্ণালীর ছবিটা।

আমরা দেখেছি ঠিক রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ নয়, এর উপাদান মৌলিক পদার্থগুলোই বর্ণালীর লাইনগুলোর জন্য দায়ী। কাজেই স্পষ্টতঃ বর্ণালীর সৃষ্টির কারণ নিহিত পরমাণুর মধ্যে, কারণ তার পরমাণুই মৌলিক পদার্থের স্বকীয়তার জন্য দায়ী। এখন পরমাণু জিনিষটা সরাসরিভাবে পরীক্ষা করা বিজ্ঞানীর ক্ষমতার বাইরে। বাইরের নানা সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে একজন বিজ্ঞানী-পরমাণুর একেকটি ছবি খাড়া করেছেন, তারপরে অন্যান্য সাক্ষী-সাবুদের চাপে তাতে নানা রকম পরিবর্তন এসেছে। বর্ণালীর সঠিক ব্যাখ্যার জন্য পরমাণুর যে চিত্র নীল বোর খাড়া করলেন খুব সংক্ষেপে তা' এই। ধনাত্মক তড়িতের কণা প্রোটন ও তড়িত—নিরপেক্ষ কণা নিউট্রন জড়াজড়ি করে আছে পরমাণুর মাঝখানে, যার নাম দেয়া হয়েছে 'নিউক্লিয়াস', আকারে গোটা পরমাণুর খুব ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ দখল করলেও এর ভরের প্রায় পুরোটাই আসে 'নিউক্লিয়াস' থেকে। পরমাণুর অংশটুকু ফাঁকা শূন্য। তাতে বিভিন্ন বৃত্তাকার কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে চরকিবাজী করছে, ঋণাত্মক তড়িত কণা ইলেকট্রন। তড়িতের পরিমাণ প্রোটনের সমান ও বিপরীত হলেও এর কোন ভর নেই বল্লেই চলে। নীল বোর তাই কক্ষপথগুলোকে বল্লেন একেকটি 'শক্তি-মাত্রা'

energy-level)। এদের প্রত্যেকটির ইলেকট্রনের একটা নির্দিষ্ট শক্তি রয়েছে। প্রত্যেকটি ইলেকট্রনকেই এ সব নির্দিষ্ট শক্তি-মাত্রার কোন না কোনটিতে থাকতে হবে। এর মাঝামাঝি কিছুতেই থাকা চলবেনা। এখন ধরা যাক সোডিয়াম বাষ্পকে আগুনে পোড়া হচ্ছে, উত্তাপের ফলে সোডিয়াম পরমাণুর মধ্যে বাইরের ইলেকট্রনগুলোর শক্তি বেড়ে যাবে, যার ফলে এর নিজেদের নির্দিষ্ট শক্তি-মাত্রা ছেড়ে কোন শক্তিমাত্রায় চলে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যে ইলেকট্রন সেই শক্তি-মাত্রার, তার সেখানেই থাকা নিয়ম, কাজেই এরকম অস্বাভাবিক অবস্থা বেশীক্ষণ চলে না। শিগ্‌গির তাকে পুরানো শক্তি মাত্রায় ফিরে আসতে হয়। তার এই ফিরে আসাটা হয় এক-লাফে উচ্চতর থেকে কোন নিম্নতর শক্তি-মাত্রায়, মাঝামাঝি অবস্থাগুলো পার হয়ে নয়। ব্যাপারটা প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে সিদ্ধ। এই লাফ দেয়ার সময় বাড়তি শক্তিটুকু বিকর্ণ হয়—বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো হিসেবে যার থেকে আমরা বর্ণালীতে বিশেষ একটি লাইন পাই। তখন বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন ধরনের শক্তি-মাত্রা আর তাতে ইলেকট্রনের বন্টন ব্যবস্থাও বিভিন্ন। যার ফলে বিভিন্ন পরমাণুর জন্য বিভিন্ন এক এক সেট লাইন আমরা পেয়ে থাকি। বলা বাহুল্য, বর্ণালীর কতগুলো জটিলতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম।

বর্ণালীর লাইনগুলোর বেশ ভালো একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলোনা। শিগ্‌গিরই এতে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। খুব ভাল বর্ণালী বীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সযত্ন পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে বর্ণালীর লাইনগুলো ঠিক গোটা গোটা নয়। একেকটা লাইন খুব কাছাকাছি সরু কয়েকটা লাইনের সমষ্টি মাত্র। যাদের প্রত্যেককে বলা হল 'সূক্ষ্মরেখা' (fine structure)। নীল বোরের ব্যাখ্যায় এর কোন কারণ পাওয়া গেল না। এরজন্য পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কিছু পরিবর্তিত ব্যাখ্যা নিয়ে এলেন সমারফিল্ড। তিনি বল্লেন ইলেকট্রনের কক্ষপথগুলো ঠিক বৃত্তকার নয়। এরা হল এক একটা উপবৃত্ত (ellipse) যার ফোকাসে রয়েছে নিউক্লিয়াস। একই শক্তিমাত্রার বিভিন্ন উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রতা (eccentricity) বিভিন্ন রকম হতে পারে যার মধ্যে একটার উৎকেন্দ্রতা হয়তো এক। অর্থাৎ প্রত্যেক শক্তি-মাত্রার বিভিন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন উপবৃত্তকার কক্ষে থাকবে যার মধ্যে একটা উপবৃত্ত হয়তো বৃত্তে পর্যবসিত হয়। এখন উচ্চতর শক্তিমাত্রা থেকে একটা স্বাভাবিক শক্তিমাত্রায় ফিরে আসার সময়

ইলেকট্রন শক্তি বিকীর্ণ করে বলে বর্ণালীতে লাইন দেখা যায়। বিভিন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন উপবৃত্তে ফিরে আসে বলে লাইনের মধ্যে আবার সূক্ষ্মতর লাইন দেখা যায়।

আপাততঃ কিছু জটিলতার সমাধান হলো বটে কিন্তু দেখা দিল নূতন জটিলতা। যার জন্য প্রয়োজন হলো সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক এক নূতন বলবিদ্যার—কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। এখানে যাবতীয় পারমাণবিক ব্যবস্থাকে ধরা হলো সম্ভাবনা তরঙ্গের সমীকরণে। এ-সমীকরণের সমাধান থেকে জানা সম্ভব পরমাণুর নানা খবর—তেজ বর্ণালী।

শুধু বাইরের ইলেকট্রনগুলোই নয়, আজকালকার দিনে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরমাণু কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসকে বোঝা। জিনিষটা আরো জটিল ও দুর্বোধ্য। এক্ষেত্রেও বর্ণালী আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে। বর্ণালীর এক একটা লাইনের ভেতর কয়েকটি সূক্ষ্মতর লাইন আমরা দেখেছি। কিন্তু এটাই বর্ণালীর প্রকৃত রূপ নয়। আরো সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে, এক একটা সূক্ষ্ম রেখাও কতগুলো অতি-সূক্ষ্ম (Hypes-fine) রেখার সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে, এর কারণ নিহিত রয়েছে আগের মত পরমাণুর বহির্ভাগে নয়, এর নিউক্লিয়াসের মধ্যে। দেখা গেল নিউক্লিয়াসকে প্রোটন নিউট্রনে জড়াজড়ি করে থাকা ভাল মানুষটি বলে মনে করা চলে না। তার মধ্যেও রয়েছে নানা জটিলতা, নানা ধরনের গতিবিধি, দরবেশী নাচের পাক ইত্যাদি। এ সব পরীক্ষাতে বর্ণালী অনেকাংশে আমাদের পথ প্রদর্শক হয়েছে। নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী খবর বয়ে নিয়ে আসে ভঙ্গুর তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি। এদের পরীক্ষার জন্য আবার সেই বর্ণালী। আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্র অত্যন্ত বিচিত্র হলেও এই ধরনের বর্ণালীর মূলে রয়েছে সেই একই নিয়ম।

একভাবে দেখতে গেলে সব কিছুর শুরু সেদিন থেকেই যেদিন 'প্রিজম' হাতে নিউটন শিশু-চোখের কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছিলেন সাত রঙে রাঙা এই ঝলমলে জিনিষটার দিকে।

১৯৬৫

পরমাণু ঃ যুগে যুগে

ক্ষিত্যপতেজোমরুৎব্যোম ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি বিদঘুটে একটি নাম সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বকে সরল করে দেখার চেষ্টা থেকেই এই বিদুঘটে শব্দটির উৎপত্তি। সমাসবদ্ধ এই শব্দটির ভেতর রয়েছে পঞ্চ ভূতের নাম ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (পানি), ব্যোম (আকাশ)। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জটিল বিশ্বের সব কিছুকে এই পঞ্চ ভূতের সমন্বয়ে তৈরী বলে মনে করতেন। প্রকৃতির সুবিশাল ইমারতকে এভাবে কয়েকটি মাত্র সরল 'ইটে' বিশ্লিষ্ট করার এই যে প্রয়াস, এটা শুধু প্রাচীন ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। এ প্রয়াস আরো সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের হাতে।

খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে এম্পিয়ডেকল মনে করতেন প্রকৃতির সব কিছু চারটি মৌলিক বস্তু ও চারটি মৌলিক গুণ দিয়ে তৈরী। মৌলিক বস্তুগুলো হল মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন এবং মৌলিক গুণগুলো হল ঠাণ্ডা, ভেজা, শুকনা এবং তাপ। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলতেন জটিল বস্তু কাঠের সাথে মৌলিক গুণ তাপ মেশালে কাঠ তার তিনটি মৌলিক উপাদান মাটি (ছাই), আগুন ও বাতাসে বিশ্লিষ্ট হয়। যদিও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এসব কথার বৈজ্ঞানিক মূল্য খুব বেশী ছিলনা, তবুও পরবর্তীকালের আলকেমী প্রভৃতি বিদ্যার উপর এবং সে যুগের পরমাণু তত্বের (Atomism) উপর এ ধরনের চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল।

'Atom' কথাটির জনক হলেন গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস। গ্রীক ভাষায় এর শব্দার্থ হল 'অবিভাজ্য'। খুব সম্ভব আজ থেকে দু'হাজার তিনশ' বছর আগে এথেন্সে তিনি বাস করতেন। তাঁর মতে যে কোন জিনিষকে ক্রমাগত ভাগ করে যেতে থাকলে আমরা অবশেষে একটি পরম উপাদানের সন্ধান পাব যাকে আর ভাগ করা অসম্ভব। এটাকেই তিনি নাম দিয়েছিলেন Atom বা অবিভাজ্য। ডেমোক্রিটাস ও তাঁর মতাবলম্বী তৎকালীন দার্শনিক গোষ্ঠিকে সাধারণতঃ Atomist বলে উল্লেখ করা হয়। এটমিষ্টদের চিন্তাধারার সাথে-আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক দার্শ-

নিকদের অনেকগুলো দোষত্রুটিই এঁরা এড়িয়ে গিয়েছেন। এঁদের মতে এটম-গুলো সব এলোপাথাড়ি ছুটাছুটি করে আর তাদের পরস্পরের মধ্যে আছে শূন্য স্থান। এটম অবিনাশ্য। এটা সব সময় গতিশীল ছিল এবং চিরকাল থাকবে। এটমের সংখ্যা অসীম। বিভিন্ন প্রকারের এটমের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে শুধু আকার ও আকৃতির। এসব ধারণার মধ্যে অদ্ভুত আধুনিকতার গন্ধ রয়েছে যা সেকালের অন্যান্য মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অকল্পনীয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে প্রাচীন বিজ্ঞানের অন্য যে কোন থিওরীর চেয়ে এটমিষ্টদের থিওরী আধুনিক বিজ্ঞানের অধিকতর কাছাকাছি।

অথচ এই এটমিষ্টগণ যে সেকালের সুধী সমাজে খুব সমাদৃত হয়েছিলেন তা নয়। এরিষ্টটল ছিলেন এটমিষ্টদের মতবাদের তীব্র সমালোচক। পরবর্তী-কালে এরিষ্টটলীয় বিজ্ঞানের (অনেক ক্ষেত্রেই যা ছিল অপবিজ্ঞান) প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে এটমিষ্টদের মতবাদ দীর্ঘ দুই হাজার বছরের জন্য বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যায়। অবশেষে ইউরোপে রেনেসাঁর সাথে সাথে দর্শন ও বিজ্ঞান আবার এরিষ্টটলীয় প্রভাব থেকে গা ঝাড়া দিয়ে মুক্ত হবার সুযোগ পেল। তারো পরে এটমিষ্ট মতবাদের হারিয়ে যাওয়া সূত্রের খেই প্রথম তুলে নিলেন বৃটিশ রসায়ন-বিদ ডালটন, তিনি পরমাণুর অবিভাজ্যতা স্বীকার করে নিলেন। সরল কিন্তু দৃঢ় গাণিতিক নিয়মের আওতায় নিয়ে আসলেন তিনি বিভিন্ন পরমাণুর সংমিশ্রণ ক্রিয়াকে। এ ভাবে ডালটন প্রাচীন পরমাণু-তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।

এটমিষ্টদের যুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে আসতে বিজ্ঞান তার চেহারা অনেকখানি পাল্টিয়েছে। এটমিষ্টরা দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমে পরমাণুর উপর যে অবিভাজ্যতা আরোপ করেছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধোপে সেটা টিকলনা। ধীরে ধীরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে যতই তথ্য জমতে লাগল ততই পরমাণু আর অবিভাজ্য রইলনা। দেখা গেল পরমাণু কতগুলো ক্ষুদ্রতর কণিকা দিয়ে গঠিত। এই কণিকাগুলোকেই অবিভাজ্য বলা যেতে পারে, পরমাণুকে নয়। কিন্তু সেই পুরানো নাম আর বদলানো হল না। নামের বেলায় পরমাণু বা Atom অবিভাজ্যই রইলো।

বিদ্যুৎ-এর জনক বলে বিখ্যাত মাইকেল ফ্যারাডে কতগুলো তরল পদার্থের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ (Electrolysis) সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ লক্ষ্য করেন। তিনি দেখালেন যে বৈদ্যুতিক চার্জের একটা

নিম্নতম একক রয়েছে। বিদ্যুৎ বাহক যে কোন কণা এর সমান বা এর দ্বিগুণ, তিনগুণ বা ততোধিক গুণ চার্জ বহন করতে পারে কিন্তু কখনো এর ভগ্নাংশ নয়। এই নিম্নতম চার্জের পরিমাণও ফ্যারাডে বের করে দিয়েছিলেন। এসব ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এ শতাব্দীর শেষের দিকে পদার্থবিদরা গ্যাসের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের নিয়মাবলী সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ক্রুক্স টিউব নামক এক ধরনের বায়ুশূন্য নলের ভেতর নানা গ্যাস ভরে তার মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে তাঁরা দেখলেন যে এতে করে নলের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় একটি রশ্মি পাওয়া যাচ্ছে যার নাম তাঁরা দিলেন ক্যাথোড রশ্মি। দেখা গেল চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে রাখলে এই রশ্মি এমন ভাবে বাঁকে যে তাতে মনে হয় এটা ঋণাত্মক (negetive) বিদ্যুৎ বাহকের প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ সময় ক্যাম্ব্রিজের বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ ছিলেন জে. জে. থমসন। তিনি স্থির করলেন ক্যাথোড রশ্মির মধ্যে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-এর যে বাহক রয়েছে বলে বলা হচ্ছে তার চার্জের পরিমাণ ও ভর (mass) তিনি বের করবেন। বলবিদ্যার (mechanics) সাধারণ নিয়ম খাটিয়ে তিনি চার্জকে ভর দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হবে তা বের করলেন। এখন আলাদা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি এই বাহকের চার্জের পরিমাণ নির্ণয় করলেন। দেখা গেল এটা হুবহু ফ্যারাডের নিম্নতম এককের সমান। অতএব, জানা গেল বাহকটির ভর। পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে হালকা হলো হাইড্রোজেনের পরমাণু। এই বাহকটির ভর সেই হাইড্রোজেন পরমাণুর দুই হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। এভাবে থমসন আবিষ্কার করলেন এমন কণিকা যাতে রয়েছে এক একক পরিমাণ ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আর যার ভর সবচেয়ে হালকা পরমাণুরও দুই হাজার ভাগের এক ভাগ। এদ্দিনকার অবিভাজ্য পরমাণুর একটি খণ্ড অংশের হদিস পাওয়া গেল। এর নাম দেয়া হল ইলেকট্রন।

প্রাপ্ত তথ্যকে সম্বল করে এবার থমসন পরমাণুর মূর্তি গড়তে লেগে গেলেন। পরমাণু জিনিষটা বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। অথচ ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ রয়েছে। কাজেই শুধু ইলেকট্রন হলেই চলবেনা একে নিরপেক্ষ করার জন্য ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন কিছু চাই। তিনি ধরে নিলেন পরমাণু জিনিষটা আগাগোড়া ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন, বেশ ভরযুক্ত পদার্থে তৈরী এবং ঋণাত্মক হালকা ইলেকট্রনগুলো এর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে ঠিক যেমন করে তরমুজের ভেতর থাকে তার বীচিগুলো। তরমুজের শাঁসটুকু যেন ধনাত্মক

বিদ্যুতের বাহক আর বীচিগুলো ঋণাত্মক বিদ্যুতের। ভরের বেশকম থাকলেও এই দুই বিদ্যুৎ-এর পরিমাণ সমান। কাজেই সামগ্রিক ভাবে তরমুজটি বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। অবশ্য সবসময় মনে রাখতে হবে আলোচ্য তরমুজটির আকারের কথা। এর ব্যাস এক ইঞ্চির এক'শ কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম। পরমাণুর এই যে মূর্তি থমসন সাহেব দিলেন, একে বলা যেতে পারে থমসন মডেল।

থমসন মডেল কিন্তু বেশীদিন চললনা। এতে বলা হয়েছে পরমাণুকে উত্তেজিত করা হলে ইলেকট্রনগুলো স্থিতি অবস্থার কাছে থেকে কাঁপতে থাকে আর এই কম্পনের ফলে বিদ্যুৎ চৌম্বক তত্ত্ব (electromagnetic theory) অনুসারে তেজ বিকীর্ণ হতে থাকে। আমরা জানি এক একটি মৌলিক পদার্থ থেকে অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণু থেকে তার বিশিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (wavelength) তেজ বিকীর্ণ হয়। ইলেকট্রনের কম্পন হারের সাথে বিকীর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঠিক সম্পর্ক বহু হিসেব-নিকেশের ফলেও ঘটানো গেলনা। কাজেই থমসন মডেলের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠল। থমসন মডেল চরম মার খেল থমসনেরই একজন ছাত্র রাদারফোর্ডের হাতে; যিনিও পরে ক্যাভেণ্ডিশের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

রাদারফোর্ড এমন একটি পরীক্ষা কার্য চালালেন, যাকে থমসন মডেল দিয়ে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা হলো রাদারফোর্ডের বিখ্যাত Alpha Scattering এর পরীক্ষা। এর কিছুদিন আগে তেজস্ক্রিয়তা (Radio activity) আবিষ্কৃত হয়েছিল। আলফা রশ্মি হল তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে স্বতস্ফূর্ত ভাবে নির্গত ধনাত্মক বিদ্যুৎধারী (দুই নিম্নতম একক চার্জ) কণিকার প্রবাহ। রাদারফোর্ড দেখালেন যে পাতলা ধাতুর পাতের মধ্য দিয়ে আলফা রশ্মিকে নিয়ে গেলে বেশীরভাগ কণিকা আগের গতিপথ বজায় রাখে বটে কিন্তু কিছু কিছু কণিকা এদিক-ওদিক অনেকখানি বেঁকে যায়। কয়েকটা তো একেবারে সোজা উল্টো দিকেই ফিরে আসে। ধাতুর পাতে যে সব পরমাণু আছে সেগুলো যদি থমসন মডেলের মত হতো তবে এটা কিছুতেই সমভব হতোনা। কারণ এতে পরমাণুর ধনাত্মক বিদ্যুৎ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকার কথা এবং ফলে এটা আলফা কণিকাকে অতখানি বিকর্ষণ করার কথা নয়। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে যে থমসন মডেলের মত পরমাণুর পুরো দেহ জুড়ে না থেকে এর থেকে ভর ও ধনাত্মক বিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থলে একটি জায়গায় (প্রায় একটি বিন্দুতে) জমাটবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে সাধারণ বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে হিসেব কষে আলফা কণিকার যেমনটি যতখানি বাঁকার কথা পরীক্ষিত তথ্যের সাথে তা হুবহু মিলে যায়।

অতএব স্বীকৃত হলো পরমাণুর নূতন চেহারা রাদারফোর্ড মডেল। এতে পরমাণুর প্রায় পুরাটুকু ভর এবং পুরো ধনাত্মক বিদ্যুৎ আবদ্ধ রইল ছোট নিউক্লিয়াস বা পরমাণুকেন্দ্রে আর ইলেকট্রনগুলো এর চারিদিকে ঘুড়ে বেড়াতে লাগল বিভিন্ন কক্ষপথে ঠিক যেমন করে সৌরজগতে গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। ঠিক যেন একটা অতি ক্ষুদে সৌর জগত। গ্রহগুলোকে কক্ষপথে রাখে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং এক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলোকে কক্ষপথে রাখে এর উপর বিপরীতধর্মী নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ। পরমাণু নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের তুলনামূলক আকারের ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা একটা উপমা ব্যবহার করতে পারি। পরমাণু যদি হয় একটা ফুটবল খেলার মাঠ তবে নিউক্লিয়াস হবে সে মাঠের মাঝখানে রাখা ফুটবলটি আর এক একটি ইলেকট্রন হবে সে মাঠের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন এক একটা মাছি। ফুটবলটি আর মাছি কটি ছাড়া পুরো মাঠটা একেবারে ফাঁকা (vacuum)। কাজেই পরমাণুর এবং সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের বেশীরভাগ জায়গাই আসলে ফাঁকা।

এর কিছুদিন পর রাদারফোর্ডের দু'জন ছাত্র গাইগার ও মার্সডেন দেখান যে বিভিন্ন মৌলিক পদাথের মধ্যে বেশকম হচ্ছে এদের নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক বিদ্যুৎ এককের সংখ্যার প্রভেদ। এই সংখ্যা আবার ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলোর সংখ্যার সমান। সবচেয়ে হালকা পরমাণু হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে রয়েছে এক একক ধনাত্মক বিদ্যুৎ আর এর ইলেকট্রনের সংখ্যাও এক। সবচেয়ে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হচ্ছে ৯২। এই সংখ্যাগুলো রসায়নবিদের ব্যবহৃত মৌলিক পদার্থের ক্রমিক নম্বরের (Atomic number) সাথে মিলে যায়।

পরমাণুর রাদারফোর্ড মডেলটিই এখন পর্যন্ত মোটামুটি চলে আসছে, তবে একেবারে অপরিবর্তিত অবস্থায় নয়। সেই পরিবর্তনের কথায় আসতে আমাদেরকে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সাথে পরিচিত হতে হবে। সে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। এতে আমরা বস্তু-কণা ছাড়া শক্তিকণারও সাক্ষাত পাব। সে আলোচনা আরেকদিনের জন্য তোলা রইল।

চলমান ভূভাগ

যদি বলি কার্জন হলটা লর্ড কার্জনের আগে ছিলনা ; তবে কারো সন্দেহের কোন কারণ থাকবেনা। যেহেতু ব্যাপারটা ইতিহাসের। কিন্তু যদি বলি এটা আগে বুড়ীগঙ্গার তীরে ছিল। সেখান থেকে কোন যাদু মন্তরে জানি রমনায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। সেটাও কি ইতিহাসের কথা হবে? হতেও পারে, তবে সে ইতিহাস মোগল পাঠানের নয়। তা হবে পৃথিবীর ভূতাত্বিক ইতিহাস, সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে এর নানা ভাঙ্গন গড়নের ইতিহাস। এ ইতিহাস বলে, পৃথিবীর আজ যে চেহারা অতীতে এক সময় তা ছিলনা, ভবিষ্যতেও এমনটি থাকবেনা। পৃথিবীর চেহারার এই যে ক্রমপরিবর্তন তার পেছনে যে কয়টি কারণ কাজ করছে তারি একটা হচ্ছে মহাদেশগুলোর গতিশীলতা। কথাটা শুনতে হয়ত একটু অদ্ভুতই লাগবে, কেননা ঠিক এ কারণটির সাথে আমরা একটু কম পরিচিত। কিন্তু আজকের দিনে অনেক ভূতাত্বিক বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর বড় বড় ভূভাগগুলো ধীরে ধীরে এদিক ওদিক সরে গেছে। কাজেই ভূতাত্বিক ইতিহাসের ছাত্র পুরা এশিয়া মহাদেশকে নূতন জায়গায় সরে যেতে দেখলে বিস্মিত হবে না, কার্জন হল তো কোন ছার!

ইংরেজ ভূগোলবিদ এডওয়ার্ড সেবিন ১৮২৩ সালে আবিষ্কার করেছিলেন গ্রীনল্যাণ্ডের পাশে ছোট একটা দ্বীপ। সাথে সাথে তিনি দ্বীপটা মাপজোপ করে এর অবস্থান আয়তনের নানা খুঁটিনাটিও জেনে নিয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে অন্যরা যখন আবার মাপজোপ করলেন, দেখা গেলো সেবিনের স্থিরকৃত অবস্থান থেকে এটা ৪২০ মিটার পশ্চিমে সরে গেছে। ভুলের সম্ভাব্য মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলেও এ নিয়ে আর কেউ বেশী উচ্চবাচ্য করলনা। কিন্তু চল্লিশ বছর পর ডেনীশ সরকার এ অঞ্চলটা জরিপের বন্দোবস্ত করলে দেখা গেল যে ১৮৬৯ সালের মাপ থেকে দ্বীপটা আরো আধ মাইলেরও বেশী সরে গেছে। এবার আলফ্রেড ভেগনার নামক জনৈক যুবক ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করলেন। তাঁর স্থির ধারণা হলো দ্বীপটা সত্যিসত্যি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের আরো কতগুলো দ্বীপকে পরীক্ষা করে তিনি দেখালেন

যে, এরা সব বিভিন্ন গতিতে পশ্চিমে সরে আসছে। এখানেই তিনি থামলেন না, তিনি বোঝাতে চাইলেন যে পুরা আমেরিকা মহাদেশটাই ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী সরছে। এর একটা পরিমাপও তিনি দিলেন। তাঁর মতে ইউরোপ আর আমেরিকার মাঝে আটলান্টিক প্রতিদিন এক ইঞ্চির পঁচিশ ভাগের এক ভাগ করে বড় হচ্ছে। এভাবে দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে সব সৈন্য আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈন্যদের তার চাইতে ত্রিশ ফুট বেশী সমুদ্র ডিঙ্গাতে হয়েছে।

সূত্রপাত হল একটা নূতন মতবাদের। এটা বলল পৃথিবীর সব ভূ-খণ্ডই তাদের ভৌগোলিক অবস্থান বদলায়। মিশরের ফেরাউনরা এ যুগে আসলে তাদের পিরামিডগুলো আর যথাস্থানে খুঁজে পাবেনা। কারণ ইতিমধ্যে এরা আড়াই মাইলের মত সরে গেছে। এই মতানুসারে রোম সরে আসছে বিষুব রেখার দিকে। অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ মেরুর দিকে আর পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

তবে ভেগনার যা দিলেন তা হচ্ছে একটা থিওরী মাত্র। থিওরী আর সত্য সব সময় একার্থক নয়। ব্যাঙ প্রথম জীবন ব্যাঙাচিরূপে জলে কাটায়, এটা একটা সত্য। কিন্তু তাই বলে ব্যাঙের পূর্বপুরুষরা জলচর ছিল এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিছক একটা থিওরী। ভূ-খণ্ডগুলো যে স্থান বদলাচ্ছে এটা সম্ভবতঃ একটা সত্য। কিন্তু ভেগনার সেটা যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তা এখনো ভূতত্ত্ববিদদের গবেষণার বস্তু, অতএব এখনো থিওরীর পর্যায়ে। আমরা সেভাবেই জিনিষটাকে নেব।

চলমান ভূখণ্ডের মতবাদ ভেগনারের মৌলিক সৃষ্টি নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ফ্রান্সিস বেকন এ ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবু ভেগনার-কেই এই মতবাদের জন্মদাতা বলা হয়, কারণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁকেই আবিষ্কর্তার সম্মান দেয়া হয় যিনি শুধু সম্ভাবনা স্বীকার করেই ক্ষান্ত হন না, বরং যথোপযুক্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনুশীলনের দ্বারা একে একটা সুষ্ঠু রূপও দিয়ে যান। তাই রোমান ক্রেটিয়াস আর জার্মান গ্যেটে বিবর্তনবাদের কথা বলে থাকলেও লেমার্ক আর ডারউইনকেই এর জন্মদাতার আসন দেয়া হয়। আর এই অর্থেই শুধু কলম্বাস আমেরিকার, জেমস ওয়াট ষ্টিম ইঞ্জিনের এবং আইন-ষ্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ববাদের আবিষ্কর্তা। গ্রীনল্যাণ্ডে কাজ করতে গিয়ে বরফের মধ্যে আটকে ভেগনারের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর এই মতবাদের প্রচারে কিছুটা ভাটা পড়ে।

সেই পুরনো আমলের খসড়া মানচিত্র দেখেই ফ্রান্সিস বেকন একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন যে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সাথে ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ঠিক খাঁজে খাঁজে মিলে যায়। এর থেকেই ১৯১০ সনের দিকে ভেগনার অখণ্ড ভূভাগের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে সবগুলো মহাদেশ, দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি মিলে পৃথিবীর স্থলভাগটা ছিল একটা অখণ্ড বস্তু। এরপর আবর্তনের ফলে এর বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশরূপে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। আজ ঠিক এ মতবাদটি সোজাসুজি গ্রাহ্য না হলেও উন্নততর গবেষণার ভিত্তি হিসেবে এর মূল্য অনেক।

মহাদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে তার গাছপালা, জীবজন্তু সবকিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যে সব জায়গায় আজকাল কয়লার খনি রয়েছে, মনে করতে হবে অতীতে সেখানে এক বিশেষ ধরনের জঙ্গলে ভর্তি ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রধান কয়লা খনিগুলো আমেরিকার পেনসেলভেনিয়া থেকে পূর্ব দিকে ইউরোপের ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সাইলেশিয়া, পোলাণ্ড হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত একটা মালার আকারে সাজানো। এটা কি মহাদেশগুলোর অতীতকালীন ঐক্যই সূচিত করছে না? কতগুলো বিশেষ ধরনের পোকামাকড় ও স্তন্যপায়ী জীবের প্রাচুর্য লক্ষ্য করলেও এটা প্রমাণিত হয়। অবশ্য চলমান মহাদেশের পরিকল্পনা ছাড়া যে এসব জিনিস আর কোন রকমে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা নয়। তবে এটাই সহজতম ব্যাখ্যা।

আধুনিক ভূতাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এ মতবাদকে একটু নূতন ছাঁচে ঢেলে নিতে হয়েছে। অখণ্ড ভূভাগ পরিকল্পনা আর থাকলো না। কল্পনা করতে হল দু'টা বৃহৎ ভূভাগের, একটা দক্ষিণে আণ্টার্কটিকায় আরেকটা উত্তরে গ্রীনল্যাণ্ডের কাছে। এ দু'টা ভূভাগের মাঝখানের ফাঁকটা এখনো সূচিত করছে আমেরিকার এন্টিলেস থেকে পূর্বে আটলান্টিকের তলদেশ দিয়ে ভূমধ্য-সাগর অববাহিকা হয়ে হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সংযোগ রেখা। এন্টিলেস, ভূমধ্যসাগর আর হিমালয়ের আদ্যাংশ দিয়ে এটাকে বলা হয় এন্টি-মেডি-হিম। এন্টি-মেডি-হিমের দক্ষিণে যত ভূভাগ—দক্ষিণ আমেরিকার, আফ্রিকা, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া এবং আণ্টার্কটিকা দক্ষিণের বৃহৎ ভূভাগ গণ্ডোয়ানার অন্তর্গত ছিল। গণ্ডোয়ানার পরিকল্পনাটা চলমান ভূভাগ মতবাদেরও পুরাতন। উনবিংশ শতাব্দীতেই এডওয়ার্ড সুইস নামক জনৈক বিজ্ঞানী ভারতের একটা প্রদেশের নামানুসারে এর নামকরণ করেন।

পৃথিবীর বাকী অংশকে নিয়ে উত্তরে যে বৃহৎ ভূভাগ ছিল তার নাম লরেশিয়া। এই দুই ভূখণ্ড, লরেশিয়া আর গণ্ডোয়ানা, পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তির জন্য ক্রমে বিষুব রেখার দিকে ঘরে এসেছে। অবশেষে বিষুব রেখায় এসে তারা পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে আবার উল্টো দিকে সরে গেছে। এভাবে গত পঞ্চাশ কোটি বছরে এরা পাঁচবার ধাক্কা খেয়েছে। বর্তমানে এরা পরস্পরের দিকে এগুনোর অবস্থাতেই আছে। অনেকে মনে করেন যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অতীতে একটি মহাদেশের অংশ ছিল। আসলে এটা কিন্তু ভুল। উত্তর আমেরিকা লরেশিয়ার আর দক্ষিণ আমেরিকা গণ্ডোয়ানার অংশ। এরা মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়ে মধ্য আমেরিকার দ্বারা সংযুক্ত হয় আবার মধ্য আমেরিকার ভাঙ্গনের মাধ্যমে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের এক এক যুগে।

আজকের দিনে উত্তর ও দক্ষিণের এ দুই বৃহৎ ভূখণ্ডে প্রধান সংঘর্ষ স্থান হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দিকটায় যেখানে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এই তিন মহাদেশ এসে যুক্ত হয়েছে। অতীতের বহু ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে ঠিক এই জায়গাটিতে। এর ভূতাত্ত্বিক বিশৃংখলা যেন তারই প্রতিধ্বনি। সংঘর্ষের আজো বিরাম নেই। পম্পিয়াই নগরী এখানেই ছাইয়ের তলে চাপা পড়েছিল। একটি উৎসবমুখর দিনে এখানকারই সেণ্টপীয়ের শহর আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়েছিল।

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে কয়েক কোটি বছর মানুষের জীবন ইতিহাসের কয়েক সেকেণ্ডের বেশী নয়। লাখ লাখ বছর ধরে যে পরিবর্তনগুলো হয়, মানুষের জীবনকালে তা' হয়ত মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। লরেশিয়া আর গণ্ডোয়ানা উভয়ই এখন ভেঙ্গে চলেছে। গণ্ডোয়ানার ভাঙ্গনটাই শুরু হয়েছে আগে। এর বিচ্ছিন্ন অংশ ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, পলিনেশিয়া আর আণ্টার্কটিকা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সরে গেছে। ভারতবর্ষ এখন চলেছে পূর্বদিকে, যেন এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশে যাওয়ার একটা ইচ্ছা নিয়ে। এই চলার পথে সামনে যে সব জমি পড়েছে তাকে যেন এটা লাঙ্গলের মত কষে উপরে তুলে ফেলেছে। ম্যাপে ভারতবর্ষকে যতবড় দেখায় আসলে এটা হয়ত তার চাইতে বড়। এর উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভাগ ঢুকে পড়েছে আফগানিস্থান আর তিব্বতের তলায় যার ফলে শেষোক্ত জায়গাগুলো অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেছে। এশিয়ার উচ্চতম মালভূমির সৃষ্টি হয়ত এখানেই।

আফ্রিকার মধ্যেও অনেক ব্যাপার-স্যাপার ঘটেছে। স্পেন এককালে আফ্রিকার সাথে ছিল। অর্থাৎ গণ্ডোয়ানারই একটা অংশ ছিল এটা। কালক্রমে আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউরোপের সাথে যোগ দেয়ায় এটা হয়ে পড়েছে লরেশিয়ার অংশ। এই জোড়া লাগার সময় শিলায় ভাঁজ পড়ে সৃষ্টি হয়েছে পীরানিজ পর্বতমালার। কাজেই জিব্রাল্টার নয়, পীরানিজই ইউরোপ আফ্রিকার সীমারেখা। অনেকটা এভাবেই আরব উপদ্বীপ গণ্ডোয়ানা থেকে লরেশিয়ায় পাচার হয়ে গেছে।

জ্যোতিষী কেমন করে হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যত বলে দিতে পারেন অনেকটা তেমনি আফ্রিকার উপকূল ভাগের অবস্থা থেকে এর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। মাদাগাস্কার যেমন মূল ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে তেমনি সোমালিল্যাণ্ড পূর্ব দিকে সরে আসবে। হয়তো বা এর পেছনে পেছনে আসবে নিয়াসাল্যাণ্ড। তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চলটা আফ্রিকা থেকে খসে চলে আসবে। কালাহারি মরুভূমিটাও কালে হয়ে পড়বে একটা দ্বীপ। তবে সেটা তখন আর মরুভূমি থাকবেনা আর দশটা সামুদ্রিক দ্বীপের মতই হবে উর্বর।

এশিয়া ধীরে ধীরে ঘুরছে উত্তর পশ্চিম দিকে। এ বিশাল জাহাজ যাওয়ার সময় পেছনে যে ঢেউয়ের আন্দোলন রেখে যাচ্ছে তার পাল্লায় পড়েছে দক্ষিণ পূর্ব আর পূর্বদিকের দ্বীপগুলো। এজন্যই কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইনে ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় এত বেশী। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ত বটেই; চলমানতার পুরো থিওরীটাই খুব বিতর্কিত। অনেক ভূতত্ত্ববিদ এর সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করেন।

সব কিছুতে গতি খুঁজে পাওয়াই যেন বর্তমান বিজ্ঞানের একটা ধর্ম। শেষ পর্যন্ত বিশালকায় মহাদেশগুলোকেও এটা চলমান করল। মতবাদটা ঠিক প্রতিষ্ঠিত না হলেও এর পেছনে এমন সব যুক্তি রয়েছে যার জন্য একে অবহেলা করাও যাচ্ছে না। অন্ততঃপক্ষে এটা সম্পূর্ণ নূতন একটা দিকে চিন্তার দ্বার খুলে দিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে বিশৃঙ্খল চরকিবাজি, এর শেষ কোথায় তা অবশ্য এতে উল্লেখ নেই। আর তা জেনে আমাদের কাজই বা কি?

১৯৬৩

চমকপ্রদ

।। এক ।।

পদার্থবিদ ঐক্য খুঁজেন প্রকৃতির সব আচরণের মধ্যে। যদি ঐক্য খুঁজে পান তবে তিনি জীবন সার্থক মনে করেন। যদি না পান, তবে থিওরীর পর থিওরী খাড়া করে, গণিতের দুর্ভেদ্য জঙ্গল অতিক্রম করে চেষ্টা চালিয়ে যান শেষ পর্যন্ত! এ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই চেষ্টাই চালিয়ে গিয়েছেন আইনষ্টাইন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রকৃতির সব নিয়মকে একটি ব্যাপকতর ঐক্যের বাঁধনে নিয়ে আসা যাবে। এ জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেছেন তাঁর "একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের" (Unified Field Theory) উপর। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

নেমে আসি আরো স্বল্প অভিলাষী বিজ্ঞানীদের কথায়। চলে যাই বেশ কিছু অতীতে। এম্বার ঘষে স্থির বিদ্যুৎ করার কৌশল বহু প্রাচীন কালেই লোকে জানত। তেমনি জানত প্রাকৃতিক কিছু আকরিকের চৌম্বক ক্ষমতা আছে। এর বহু বছর পরে স্থির বিদ্যুৎ-এর আকর্ষণ-বিকর্ষণের গাণিতিক নিয়ম বের করা হলো। গ্যালভানির সেই ব্যাঙ নড়ে ওঠার ঘটনা থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহও আবিষ্কৃত হল। সেই সময় কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পড়াতেন প্রফেসর ওয়েরষ্টেড। এক দিন ক্লাশে গিয়ে তাঁর হঠাৎ কি খেয়াল হল। একটি দিগ-দর্শক কম্পাস আনিয়ে টেবিলের উপর রাখা বৈদ্যুতিক তারের উপর রাখলেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি দেখলেন, যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে চুম্বক শলাকাটি এই প্রবাহের সাথে সমকোণে থাকে। আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হল যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ও চৌম্বক শক্তি এ দু'টো পৃথক কোন ঘটনা নয়। প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে রয়েছে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র। আম্পায়ার, বায়োট প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ আর চুম্বকের সম্পর্কের গাণিতিক রূপ দিলেন। আরো কিছুদিন পর ফ্যারাডে দেখালেন শুধু বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে চৌম্বক ক্ষেত্র থাকেনা, এর উল্টোটাও হতে পারে। পরিবর্তমান

চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র জড়ানো থাকে। আজ আমরা জেনারেটর থেকে যে বিদ্যুৎ তৈরী করি তা এভাবেই সৃষ্ট।

বিদ্যুৎ আর চুম্বক এ দু'টো জিনিষ আর আলাদা রইল না। সূচনা হল একটি যুগান্তকারী তত্ত্বের—বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যার সব চেয়ে নিখুঁত তত্ত্বগুলোর অন্যতম। এ তত্ত্বকে পূর্ণ সৌন্দর্য দিয়ে গেছেন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ চৌম্বক তত্ত্বের সব নিয়ম একত্র করে তিনি এগুলো চারটা ছোট সমীকরণের আকারে লিখলেন। এগুলো হল বিখ্যাত "ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ"। এই চারটা সমীকরণকে ভিত্তি করে শুধু মাত্র খাতা-পেন্সিল সম্বল করে ম্যাক্সওয়েল শুদ্ধ গাণিতিক হিসেবের মাধ্যমে দেখালেন বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র উভয়েই তরঙ্গাকার। এরা উভয়েই মানে এমন একটা সমীকরণ যা যে কোন তরঙ্গের পক্ষে সত্য—কি শব্দ তরঙ্গ, কি পানির তরঙ্গ। আরো মজার ব্যাপার হল এ সমীকরণ অনুসারে এই তরঙ্গের যে গতি হওয়া দরকার তার মানে হলো সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ম্যাক্সওয়েলের বহু আগেই বিজ্ঞানীরা নানা পরিমাপের ফল জানতে পেরেছিলেন, আলোর গতি হল সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তা হলে আলোর তরঙ্গ আর বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্যটা কি? ম্যাক্সওয়েল বল্লেন, পার্থক্য কিছুই নেই। আলো একটি বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ কলমের এক খোঁচায় ম্যাক্সওয়েল পদার্থবিদ্যার দুই বিরাট শাখা বিদ্যুৎ চৌম্বক তত্ত্ব ও আলোক তত্ত্বকে এক এবং অবিচ্ছেদ্য শাখায় পরিণত করলেন। এদ্দিন ধরে আলোর যত নিয়ম-কানুন আবিষ্কৃত হয়েছিল সব কিছুর সুন্দর বিদ্যুৎ চৌম্বক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই যোগাযোগটুকু ফ্যারাডেও আংশিক ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকেও বিদ্যুৎ চৌম্বক তত্ত্বের আওতায় নিয়ে আসা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু পরীক্ষা কার্যও চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর ডায়েরীতে লিখতে হয়েছে: "আপাততঃ আমার পরীক্ষা কার্য এখানেই শেষ হল। এসব পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস একটুকুও কমেনি যে মাধ্যাকর্ষণ ও বিদ্যুৎ-এর মধ্যে একটা সম্বন্ধ অবশ্যই আছে।" প্রায় এক শতাব্দী পর জগতের আরেকটি প্রতিভা আলবার্ট আইনষ্টাইনও ঠিক একই সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য মাথা কুটে মরছিলেন। ঐক্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানীর চিরন্তন।

বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক শক্তির প্রকৃতি ভালভাবে বুঝে উঠতেই দেখা গেল রসায়নবিদ যে রাসায়নিক বন্ধনের কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, পদার্থবিদ যে স্থিতি স্থাপকতা ও প্রবাহ ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না ও আবহবিদ মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র নিয়ে যে সমস্যায় পড়েছিলেন তার সব সমাধান খুঁজে পাওয়া বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের মধ্যে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একে একে এসে ধরা দিতে লাগলো একটা ব্যাপক ঐক্যের বাঁধনে।

এ শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিদ্যার একটা নূতন যুগ আরম্ভ হয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম তত্ত্বে গড়া এ যুগ। সেই সূত্র ধরে কয়েক দশক এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখতে পাই পদার্থবিদকে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী বিব্রত করছে তা হলো অনেকগুলো প্রোটন (সম বিদ্যুৎধর্মী, সুতরাং পরস্পরকে বিকর্ষণ করার কথা) ও নিউট্রনকে পরমাণুকেন্দ্রে জমাট বেঁধে রাখছে সে কোন শক্তি? চট করে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। চেষ্টা করা হল ইতিমধ্যে অন্যান্য ধরনের শক্তিগুলোর মধ্যে যে ঐক্য দেখা গেছে একেও সেই কাঠামোতে নিয়ে আসার।

দু'টি বিদ্যুৎ কণার মধ্যে যে আকর্ষণ থাকে আধুনিক কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয় উভয়ের মধ্যে ফোটন অর্থাৎ শক্তি-কণার বিনিময়ের মধ্যে। বৈদ্যুতিক চার্জ যত বেশী হবে ফোটন চারিদিকে ছড়াতে থাকবে। আগে যাকে বলা হত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সেটা হল ফোটন বিনিময় ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে ফোটন হলো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কণা আর চার্জ হল বৈদ্যুতিক চার্জ। কিন্তু অন্য কোন কণাকেও তো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা যদি যায় তবে সে ক্ষেত্রে চার্জটাও হবে একটু ভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন চার্জের মধ্যে বিক্রিয়াও হবে ভিন্ন। জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া অঙ্ক কষে বের করে দিলেন পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটন-প্রোটন বা প্রোটন-নিউট্রনের মধ্যে আকর্ষণের জন্য যে বিনিময় মাধ্যমের প্রয়োজন তার সব রকমের গুণাগুণ। তিনি দেখালেন নূতন কণাকে হতে হবে ইলেকট্রনের দু'শ গুণেরও বেশী ভারী। ইউকাওয়া এর নাম দিয়েছিলেন মেসন। এর বেশ কিছুদিন পর সত্যি সত্যি মেসন আবিকৃত হয়েছিল পরীক্ষামূলক ভাবে আর এর সব গুণাগুণ ইউকাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে হুবহু মিলে গিয়েছে।

কাজেই চার্জ, ক্ষেত্র এসবেরও একটা ব্যাপকতর অর্থ রয়েছে। আর এই ব্যাপকতর অর্থ ধরে নিলে যে ব্যাখ্যা আমরা বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য দিতে পারি, ঠিক একই ব্যাখ্যা নিউক্লিয়ার শক্তির জন্যও দিতে পারি। এমনি করে ক্রমেই

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে আমরা একই সূত্রের বাঁধনে বাঁধতে পারি। এই সূত্র বিশ্বের যাবতীয় বিক্রিয়াকে শুধু তীব্রতার তারতম্য অনুসারে চারটি ভাগে সাজিয়ে রাখে এবং সাথে সাথে এও বলে রাখে যে মূলতঃ প্রক্রিয়াগুলো একই। এই চার প্রকারের বিক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে জোরালোটাকে বলা হয় জোরালো-বিক্রিয়া—পরমাণু কেন্দ্রে নিউট্রন-প্রোটনের পারস্পরিক আকর্ষণ যার উপর নির্ভরশীল। এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম তীব্র হলো বৈদ্যুতিক বিক্রিয়া। আরো কম তীব্র হলো দুর্বল বিক্রিয়া-নিউট্রন, মেসন প্রভৃতির ক্ষয়ক্রিয়া (বীটা রশ্মির নির্গমণ) যার উপর নির্ভরশীল। আর সবচেয়ে কম জোরালো অতি ক্ষীণ বিক্রিয়া হলো মাধ্যাকর্ষণের বিক্রিয়া। এভাবে বিশ্বের যাবতীয় বিক্রিয়াকে একটা ছোট তালিকায় একই নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

একদিকে পদার্থবিদ্যা যে রকম দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে, বিজ্ঞানীর ঐক্য সাধনার ইচ্ছা যেন ততই বেশী তীব্র হয়ে উঠছে।

॥ দুই ॥

বেচারা গণিতবিদদের কথা ভাবছিলাম, সেই বিশুদ্ধ গণিতবিদদের কথা যাদের নাম-ধাম পরিচিতি সর্বসাধারণের কাছ থেকে বিশুদ্ধ ভাবে গোপন থাকে। নিউটন না হয় গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয়কেই আলোকিত করতে এসেছিলেন। কিন্তু এরপর আমরা ফ্যারাডে, কুরী, রঞ্জেন, রাদারফোর্ড আর ফার্মীকে যত চিনলাম লাইবনিৎস, লাপ্লাস, লরেঞ্জ, অয়েলার, হাইজেনবার্গ বা নয়মানকে তার অংশমাত্রও চিনতে পারলাম না, চিনতে চাইলামও না। অথচ এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের গাণিতিক সাধনার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিজ্ঞান দাঁড়াতে পেরেছে।

এর কারণ খুঁজতে খুব বেশী দূর যেতে হয় না। অঙ্ক-ভীতি আমাদের মজ্জাগত একেবারে ছোট বেলা থেকেই। তাই গণিত ও গণিতবিদ দুইকেই আমরা যথাসম্ভব তফাতে রাখার চেষ্টা করে আসছি। শুধু আমাদের দেশ বলেই নয়, বিশুদ্ধ গণিত চর্চা করে এমন লোক দুনিয়ার সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যা রয়েছেন। সৃজনশীল বিশুদ্ধ গাণিতিকের সংখ্যা সারা দুনিয়ায় তিন হাজারের বেশী হবে না। সংখ্যা কম হলেও এঁরা বড় একরোখা লোক। তাঁদের কথা লোকে জানুক বা না জানুক, আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁদের সৃষ্টির কোন ব্যবহার সম্ভব হোক বা না হোক, তাঁরা খ্যাপার মতো সৃষ্টি করে যাবেনই। আধুনিক বিশুদ্ধ গণিতের যে চিত্র তার সাথে আমাদের সাধারণ বস্তুজগতের কোন মিল খুঁজে

পাওয়া যাবে না। Abstruction অর্থাৎ বিমূর্ততা এখানে চরমে এসে পৌঁছেছে। বাল্যাবস্থায় সুদের হিসেব কষে বা ইউক্লিডের জ্যামিতি শিখে গণিতে যাদের হাতে খড়ি হয়েছে তাদের পক্ষে এটা খুব অদ্ভুত বলে মনে হলেও এর মূল ধারণাগুলোর অনেকই আশ্চর্য রকম সোজা। অনেক সময় শিশুশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও এরা বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে।

অসীম সংখ্যক বস্তুর সমন্বয়ের ধারণা থেকে আধুনিক গণিতের সবচেয়ে কঠিন কতগুলো জিনিষের উদ্ভব হয়েছে। জনৈক মার্কিন গণিতবিদ কিণ্ডার-গার্টেনের ছাত্রদের সামনে এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে তাঁর স্নাতোকত্তর ছাত্রদের চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে তারা এটার মূল জিনিষটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এর একটা কারণ বোধ হয় গাণিতিক বিমূর্ততার সাথে শিশুদের চিন্তাপদ্ধতির কোথায় যেন একটা আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। শিশুর কল্প-লোকের সাথে আধুনিক গাণিতিক চিন্তাধারার একটা সাদৃশ্য রয়েছে। ভুলে গেলে চলবেনা Alice in Wonderland-এর মতো মনমাতানো শিশুপাঠ্য বইয়ের লেখক ছিলেন ডজসন নামক একজন পেশাদার গাণিতিক, ছদ্মনাম লুই ক্যারোল।

সুকুমারকলার সাথে এই গণিতের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক গণিতে পুরো সাফল্য শুধু তার বুদ্ধি-নির্ভরতার জন্য নয়, তার সৌন্দর্যের জন্যও বটে। বিখ্যাত গণিতবিদ হার্ডি তাঁর "গণিতবিদের কৈফিয়ৎ" নামক বইয়ে লিখেছেন, 'শিল্পী বা কবির মত গণিতবিদের সৃষ্টিকে হতে হবে সুন্দর; শিল্পীর রঙ বা কবির শব্দের মতই তাঁর ধারণাগুলোকেও সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হতে হবে...দুনিয়াতে কুশ্রী গণিতের কোন স্থায়ী আসন নেই।' দাবা খেলার কোন সমস্যার সাথে একটি সুন্দর গাণিতিক ধারণার তফাত হচ্ছে শুধু খেলার সঠিক চালেই এর সার্থকতা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, একে গণিতের আরো দশটি ধারণার সংযোগসাধন করে পুরো গণিতশাস্ত্রকেই সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

একটি উচ্চতর রসজ্ঞান প্রত্যেক গণিতবিদদের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। বেশীর ভাগ গণিতবিদের ক্ষেত্রেই এই রসজ্ঞান সঙ্গীত-প্রীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। জগতের বহু নামজাদা গণিতবিদই যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। সাম্প্রতিক উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আইনষ্টাইন যে সময়টুকু নিজেকে ইকোয়েশনগুলো থেকে মুক্ত রাখতেন তার বেশীর ভাগই ব্যয়িত হত বেহালার সাহচর্যে।

দুনিয়ায় যেসব জায়গায় গণিতবিদদের গোষ্ঠি আছে তার অনেক কটির সাথে সঙ্গীত গোষ্ঠি, অর্কেষ্ট্রা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এই সঙ্গীত প্রীতির মূলেও রয়েছে নির্বস্তুকরণের প্রতি গণিতবিদের চিরন্তন আগ্রহ। সব রকম কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীতেই নির্বস্তুকরণ চরমে পৌঁছেছে, একেবারে গোড়া থেকেই। সঙ্গীতের মধ্যে গণিতবিদ তাই নিজের গাণিতিক ধারণাগুলোরই প্রতিফলন দেখতে পান। এমনকি সঙ্গীতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর গাণিতিক বিশ্লেষণও অসম্ভব নয়। বর্তমানে এমন কম্পিউটার যন্ত্র (বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক) রয়েছে যাকে জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ বাখের ষ্টাইলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করতে শেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। তবে কম্পিউটার রচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত কবে আমরা শুনতে পাব আর তা আমাদের কাছে আদৌ প্রীতিকর হবে কিনা কে জানে। আধুনিক বিশুদ্ধ গণিতের সাথে যাঁরা অল্প বিস্তর পরিচিত তাঁরা এই game theory নামক একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখার কথা জানেন। স্বভাবতঃই মনে হয় যে অন্ততঃ যে সব খেলা গাণিতিক নিয়মেও সম্ভাবনার সূত্র মেনে চলে সেগুলোতে গণিতজ্ঞরা পারদর্শী হবেন। সত্যি কথা, বহু গণিতবিদই দাবা ব্রিজ প্রভৃতি খেলা খেলে থাকেন, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক গণিতবিদই এগুলোতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গাণিতিক সৃজনশীলতা এ সব খেলায় পারদর্শিতার জন্য একই রকম চিন্তাধারার প্রয়োজন হলেও চিন্তার গতির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তফাত আছে। খেলার জন্য যে দ্রুত অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা বেশীর ভাগ গণিতবিদেরই ধাতে সয় না।

গণিতবিদদের মধ্যে অল্প দু'একজন আছেন, যাঁরা কোন একটা গাণিতিক জিনিষের চিত্রকল্প খুব পরিষ্কারভাবে মাথায় রাখতে পারেন বা খুব জটিল হিসাবও মনে মনে চট করে কষে ফেলতে পারেন। তাঁরা বিভিন্ন গাণিতিক রাশির মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, আপাতঃদৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক না থাকলেও। এ যুগের শ্রেষ্ঠতম গণিতবিদদের অন্যতম জন নয়মান লম্বা জটিল সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান মুখে মুখে করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারতেন। তবে এই গুণগুলো গণিতবিদদের মধ্যে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগররা যত পরিষ্কারভাবে সাধারণ বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি মাথায় রাখতে পারে এবং একাউন্টেন্টরা যত তাড়াতাড়ি নির্ভুল হিসাব করতে পারে, বেশীর ভাগ গণিতবিদই তা পারে না।

তবে একটা ব্যাপারে সব যুগের সব গণিতবিদের মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল রয়েছে, তা হলো যৌবন। গাণিতিক সৃজনশীলতা প্রায় সবার ক্ষেত্রেই যৌবনে সীমাবদ্ধ থাকে। নিউটনের নিজের মতেই তেইশ ও চব্বিশ বছর বয়সের সময়েই তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা চরমে পৌঁছেছিল। দুনিয়ার নামযাদা সব গণিতবিদই ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সের আগেই তাঁদের অবদানগুলো দিয়ে গিয়েছেন। এরপর তাঁরা সাধারণতঃ গণিত চর্চার বদলে শিক্ষকতা, দর্শন চর্চা ইত্যাদি নিয়েই কাটিয়ে থাকেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ যুগটা হল গোষ্ঠি-বদ্ধ গবেষণার যুগ। কিন্তু গণিতবিদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তিনি একা কাজ করতে ভালবাসেন। গোষ্ঠিবদ্ধ গণিত চর্চা অতি অল্পই হয়ে থাকে। এই কারণে গণিতের ক্ষেত্রে যে সব গবেষণাপত্রগুলো বেরিয়ে থাকে তার মধ্যে একাধিক লেখকের লেখা পত্র খুব কমই দেখা যায়। দুইয়ের অধিক লেখকের রচিত পত্রতো নাই বল্লেই চলে। তাছাড়া গণিতবিদের একটা মস্ত সুবিধা হলো একটা পড়ার ঘর, একটা রেফারেন্স লাইব্রেরী আর কিছু কাগজ কলম হলেই গণিতবিদের চলে যায়। পদার্থবিদ বা রসায়নবিদের জবড়জঙ্গ যন্ত্রপাতি তাঁকে আটকে রাখেনা। এদিক দিয়ে গণিতবিদের কাজ সব চেয়ে কম ব্যয়সাধ্য এ কথা চিন্তা করলে আমাদের মত দেশে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চা যদি কিছু করতে হয় তবে গণিত বা গণিত-নির্ভর তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার চর্চাই বোধ হয় সহজতম হবে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক সাধনা কোথায়, সেই গাণিতিক মনই বা কোথায় ?

॥ তিন ॥

আপনিই বলুন, এতো গরমে কি ভাল ভাবে চিন্তা করা যায় ? তাও আবার এলোমেলো চিন্তা। লিখতে বসে খালি মনে হচ্ছে ওঃ কী গরম! কিছুতেই আর গরম কাটিয়ে উঠতে পারলামনা।

এই যে আমি মুখের সামনে পকেট সাইজের বইখানা নেড়ে ঠাণ্ডা হবার প্রয়াস পাচ্ছি তাতে কি কোন লাভ হচ্ছে ? হচ্ছে বৈ কি। তবে প্রয়াসটা ঠিক ঠাণ্ডা হবার নয় গরম তাড়াবার, ঠিক যেমন করে মুখের উপর থেকে মাছি তাড়ানো হয়। যে বাতাসটুকু মুখের সাথে লেপটে আছে তা যতখানি তাপ মুখ থেকে নিতে পারে তার সবই নিয়ে নিয়েছে। এটা মুখের চারিদিকে একটা 'গরম মুখোশের' মত লেগে আছে। যতক্ষণ না আমরা এই মুখোশ ছিঁড়ে

ফেলে দিয়ে নূতন বাতাস আসার জায়গা করে না দিই ততক্ষণ মুখের গরম মুখেই থেকে যাবে। হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে খুঁচিয়ে আমরা এই মুখোশ ছেঁড়ার কাজটুকুই করে থাকি।

'ঠাণ্ডা হচ্ছি' কথাটা কেন ঠিক নয় তা বলছি। আমার বদলে একটা কাঠের টুকরোকে যদি পাখা দিয়ে বাতাস করি তাহলে কিন্তু এটা ঠাণ্ডা হবে না, অর্থাৎ এটার তাপমাত্রা কমবেনা। কাঠের টুকরো না হয়ে থার্মোমীটার হলে ব্যাপারটা চট করে প্রমাণ করা যায়। বাতাসে রাখলে থার্মোমীটারের পারা নামেনা আগের মতই থাকে।

থার্মোমীটারের কথা থেকে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। থার্মোমীটার শুনলেই আমরা মনে করি সেই ডাক্তারী যন্ত্রটা যার সরু নলে চুলের মত পারার সূতো উঠা নামা করে। আগেকার দিনের থার্মোমীটারগুলো কিন্তু এ রকম ছিল না, ছিল বেশ জবড়জঙ্গ দেখতে ও কাজে অনেকটা ব্যারোমীটারের মত। সেকালের কোন এক ক্যাবলকান্ত গোসল করার জন্য চৌবাচ্চায় নেমেছিল এমনি একটা থার্মোমীটার নিয়ে। ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে আসা মাত্রই পারা দ্রুত নামতে শুরু করল। তখন ক্যাবলকান্তের ধারণা ছিল জিনিষটা ব্যারোমীটার, থার্মোমীটার নয়। আর ব্যারোমীটারে দ্রুত পতন ঝড়, বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সূচনা করে। যেই না এটা দেখা তক্ষুণি ক্যাবলকান্ত কাপড়-চোপড় না নিয়েই ভোঁ দৌড়! কারণ তার চৌবাচ্চায় ঝড় আসন্ন!!

গরম তাড়ানোই বলুন আর ঠাণ্ডা হাওয়াই বলুন গরমের সময় একটু বাতাস বইলে জানটা বাঁচে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায় দেখবেন গরমের দিনে দরজা, জানালা এমন কি গুলগুলি পর্যন্ত ভাল করে বন্ধ করে দেয়া হয়, বাতাস যেন আসতে না পারে। 'গরম মুখোশের' থিওরী কি সেখানে খাটে না? অবশ্যই খাটে, তবে ব্যাপার হচ্ছে সেখানে শরীর যত না গরম তার চেয়েও বেশী গরম চার পাশের সব বাতাস; কাজেই এই বাতাসের সংস্পর্শে শরীর কোথায় কিছু তাপ ছাড়বে তার বদলে নিজেই তাপ নিতে আরম্ভ করে। কাজেই এ বাতাস যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল। একই কারণে আমরা যখন গরমের জ্বালায় সার্ট, গেঞ্জি বর্জন করে দিগম্বর হয়ে বসি তখন আরবের মরুভূমিতে লোকেরা লম্বা আলখেল্লায় শরীর, মুখ খুব ভাল করে ঢেকে নেয়।

কত বেশী গরম মানুষ সহ্য করতে পারে? শুনলে আঁৎকে উঠবেন না যেন—দেখা গেছে শুকনো পরিবেশে ধীরে ধীরে গরম হতে থাকলে ১৬০ ডিগ্রী

সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে! মনে রাখবেন ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পানি ফুটতে থাকে (ফুটন্ত পানিতে হাত দিয়ে তাপটা অনুভব করে দেখুন না) তারপরে আরো ৬০ ডিগ্রী! ব্ল্যাগভেন ও শেন্টি নামে দু'জন ইংরেজ বিজ্ঞানী বেশ কয়েক ঘন্টা রুটি বানাবার তন্দুরের ভেতর এই তাপমাত্রায় থেকে এটা হাতে নাতে প্রমাণ করেছেন, অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিজ্ঞানী টিন্‌ডল বলেছেন, "তোমরা যেই তাপে ডিম সেদ্ধ কর আর মাছ ভাজা কর সেই তাপে একটা লোক নিজের কোন ক্ষতি না করেই থাকতে পারে।"

কি ভাবে এই আপাত অসাধ্য কাজ সম্ভব হয়? এটা সম্ভব, কারণ আমাদের শরীর আসলে দায়ে পড়লে এই উচ্চ তাপকে দূরে রাখার উপায় নিজেই উদ্ভাবন করে নেয়। তাপ বাড়ার সাথে সাথে শরীরে খুব ঘাম দিতে থাকে আর তাপের অনেকখানি এই ঘামই শোষণ করে নেয় এবং শরীরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিকের কাছাকাছি তাপমাত্রায় রেখে দেয়। এর জন্য শুধু দু'টো শর্ত মেনে চলতে হবে, এক, শরীর তাপের উৎসের সরাসরি সংস্পর্শে আসতে পারবেনা, দুই, আশেপাশের বাতাসকে হতে হবে একেবারে শুকনো খটখটে।

এমনিতেই বাতাস শুকনো হলে অনেক বেশী তাপ মানুষ সহ্য করতে পারে। বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ার চেয়ে বেলুচিস্থানের শুকনো হাওয়ায় অনেক বেশী তাপ সহ্য করা সম্ভব হয়।

তাপ বাড়লে গরমে আমরা হাঁস ফাঁস করি এদ্দূর আমরা জানি। তাপ দিলে পানি ফুটে, মোম গলে, বেশী তাপে লোহাও গলে, এও আমরা দেখি। তবে অণুবিজ্ঞানী মনশ্চক্ষে এর চেয়ে আরো বেশী দেখেন, অনুভব করেন। তাঁর চোখে যে কোন জিনিষে তাপ দিলে তার অণুগুলো ক্রমেই বেশী থেকে বেশী জোরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে থাকে আর বড় বেশী তাপ দিলে তো ছুটতে ছুটতে একেবারে হাওয়া (গ্যাস) হয়ে যায়। যদি তাপ কমাতে থাকি? তবে ছুটাছুটিও কমতে থাকবে। বরফ যাকে আমরা শূন্য ডিগ্রী ধরে থাকি তাতেও কিছুটা তাপ থাকে (আমরা যতই ঠাণ্ডা বলি না কেন), কাজেই ছুটাছুটিও থাকে। তাপ যদি আরো কমাতে থাকি তবে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসবে যখন সব ছুটাছুটি একদম বন্ধ—নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু। এটাই হল আসল শূন্য তাপমাত্রা—সেন্টিগ্রেড বা ফার্নহিট স্কেলের মত কৃত্রিম শূন্য নয়—একেবারে 'পরম শন্য' **Absolute Zero**। সেন্টিগ্রেড স্কেলে শূন্য

ডিগ্রীর নীচে আরো ২৭৩ ডিগ্রী নেমে এলে তবেই এই পরম শূন্যের সাক্ষাত মিলবে।

পরম শূন্যের কথাটা পাড়লাম কারণ এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় পদার্থের অদ্ভুত সব আচরণ দেখা দেয়। স্কুলে কলেজে পড়া পদার্থের মৌলিক ধর্মগুলো এখানে এসে যেন অনেকখানি মিথ্যে হয়ে যায়। এই তাপমাত্রায় রাবারের বল হয়ে পড়বে কাঁচের মতই ভঙ্গুর—মাটিতে ফেল্লে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। সাধারণ বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতুগুলো এখানে এসে অতিপরিবাহী হয়ে পড়বে। সাধারণ অবস্থায় এক ইঞ্চি তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ যতখানি বাধা (Resistance) পাবে এই তাপমাত্রায় এক হাজার মাইল লম্বা তারেও সে বাধা পাবে না। সবচেয়ে মজা হয় এই তাপমাত্রায় রাখা তরল হিলিয়াম নিয়ে। তাপ অপরিবাহী হিলিয়াম এ নে তামার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশী পরিবাহী হয়ে পড়ে। টেষ্ট টিউবে রাখলে এটা আপনা আপনি টেষ্ট টিউবে গা বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং ফোয়ারার মত বাইরে উপচে পড়ে।

তবে এ সব মজার কাণ্ড দেখতে হলে পরম শূন্যের খুব কাছাকছি তাপমাত্রায় নেমে আসতে হবে। এটা চাট্টিখানি কথা নয়। বহু বছর ধরে চেষ্টা চলা সত্বেও গবেষণাগারে শুধু সীমিত ভাবে এটা সম্ভব হয়েছে। কাজেই সাত মণ ঘিও পুড়বেনা রাধাও নাচবেনা। আপাততঃ আমাদের হাতের কাছে যে মজাটা দেখা সম্ভব তাই দেখা যাক।

গরমটা বেজায় পড়েছে। এ সময় ফলমূলটা, পানিটা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে মন্দ হতনা। বাসায় দামী রিফ্রিজারেটর যদি না থাকে তবে চলুন এই ঘরবানানো, ফ্রিজটা বানিয়ে ফেলি। কিছু খরচ হবে না, না বিদ্যুৎ না বরফ। একটা কাঠের বাক্স নিয়ে এর ভেতর কয়েকটা তাক বানিয়ে দিন খাবার দাবার রাখার জন্য। উপরে একটা উঁচু পাত্রে সব সময় পানি জমা করে রাখতে হবে। এমন একটা বড় ক্যানভাসের একমাথা এই পানিতে ডুবিয়ে রেখে ক্যানভাসের বাকী অংশ দিয়ে বাক্সের পেছন দিকটা আগাগোড়া ঢেকে দিন। ক্যানভাসের অন্য মাথাটা নীচের তাকের তলায় আরেকটা পানি-ভরা পাত্রে ডুবানো থাকবে। ব্যাস্, আপনার ফ্রিজ তৈরী।

কেমন করে কাজ করে? তার আগে চিন্তা করুন মাটির কলসীতে পানি ঠাণ্ডা থাকে কেন। মাটির সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে পানি চুঁয়ে বাইরে আসলে সেটা বাতাসে বাষ্পীভূত হয়। ফলে কলসী ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এখানে বাতির সলতের মত ক্যানভাসটা পাত্রের পানি টেনে একে সব সময় ভেজা রাখবে। ক্যানভাসের

পানি অনবরত বাষ্পীভূত হতে থাকবে আর আপনার ফ্রিজও ঠাণ্ডা হতে থাকবে। রোজ বিকেলের দিকে পাত্রের পানি বদলে দিলে, রাত্রে এটা আরো ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে।

এই অল্পদামী ফ্রিজ কেউ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরী করতে চাইলে তাঁর প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মত এখানেই শেষ করছি।

১৯৬৭

অতিপরিবহণের রহস্য

কিছুদিন আগে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবার পুরস্কার পেলেন তিনজন আমেরিকান বিজ্ঞানী—জন বার্ডীন, লিয়ন কুপার ও জন শ্রীফার, ধাতুর ভেতর বিদ্যুৎ পরিবহণের উপর তাঁদের গবেষণার জন্য। প্রফেসর বার্ডীনের এটা দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার। এর আগে ট্রানসিস্টর আবিষ্কারে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ১৯৫৬ সনে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই বিজ্ঞানী তিনজনের নাম পরিচিত হোক বা না হোক, আধুনিক পদার্থবিদ্যার ছাত্র মাত্রই অতিপরিবহণ (Superconductivity) নামক ঘটনা বা তার BCS থিওরীর সাথে পরিচিত। বলা বাহুল্য BCS থিওরীর নাম এসেছে এর আবিষ্কর্তা বার্ডীন, কুপার আর শ্রীফারের নামের আদ্যাক্ষর থেকে। BCS থিওরীর মাধ্যমে অতিপরিবহণের রহস্য উদ্‌ঘাটন সাম্প্রতিক পদার্থাবিদ্যার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে ব্যাপারটা কি নিয়ে, তা দেখতে হলে আমাদের বেশ খানিকটা পিছিয়ে বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে চলে যেতে হবে।

ঘটনার শুরু হল্যাণ্ডের একটা ছোট্ট শহর লাইডেনে। শতাব্দীর শুরুর দিকে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন কেমারলিং ওনেস। তিনি চেষ্টা করছিলেন হিলিয়াম গ্যাসকে তরল পদার্থে পরিণত করতে। প্রত্যেক পদার্থের যেহেতু কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এই তিন অবস্থা রয়েছে, কাজেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সব গ্যাসকেই তরল করা সম্ভব। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি সব গ্যাসকে ইতিমধ্যেই তরল করা সম্ভব হয়েছিল। মুস্কিল হচ্ছিল শুধু হিলিয়ামকে নিয়ে। অবশেষে ১৯০৮ সনে ওনেস একেও তরল করতে সক্ষম হলেন। তরল হিলিয়াম খুবই ঠাণ্ডা জিনিষ। পরম শূন্য থেকে মাত্র ৪·২ ডিগ্রী তাপ বেশী হলেই এটা হাওয়া হয়ে যায়। আর পরম শূন্য কিনা সবচেয়ে নিম্ন তাপমাত্রা, কোন কিছুই এর চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা হতে পারে না। (এটা বরফের চেয়ে ২৭৩ ডিগ্রী নীচের তাপমাত্রা)। কাজেই তরল হিলিয়ামের

সাহায্যে ওনেস পরম শূন্যের বেশ কাছাকাছি তাপমাত্রায় নানা পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেন, যা আগে অচিন্ত্যনীয় ছিল।

এর তিন বছর পর ১৯১১ সনে এমনি একটা পরীক্ষা করতে গিয়ে ওনেস এক অদ্ভুত জিনিস দেখলেন। নিম্ন তাপে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রতি পারদের বাধা (Resistance) কি রকম পরিবর্তন হয় তিনি তারই পরিমাপ করছিলেন। তাপমাত্রা কমাবার সাথে সাথে এই বাধা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে কমতে থাকে বটে, কিন্তু তরল হিলিয়ামের কাছাকাছি তাপমাত্রায় আসা মাত্রই বাধাটা একেবারে শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ এই তাপমাত্রায় পারদ বিদ্যুৎ প্রবাহে কোন বাধাই দেয় না। একবার প্রবাহ শুরু হলে, এটা অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকে!! অথচ তখন পর্যন্ত সবাই জানত সব ধাতুই কম বেশী বিদ্যুৎ প্রবাহে একটা বাধা দিয়ে থাকে, যার ফলে প্রবাহ (current) বজায় রাখার জন্য সব সময় একটা ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ চাপ দিয়ে রাখতে হয়, সে ব্যাটারী থেকে, জেনারেটর থেকে বা অন্য যে কোন কিছু থেকেই হোক। ওনেসের আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নীচে এই বাধা শূন্য হয়ে এক ধরনের অনন্ত বিদ্যুৎ পরিবহণ সম্ভব হয়। এই বিশেষ ধরনের পরিবহণের নাম দেয়া হল অতিপরিবহণ (Superconductivity)। শিগ্‌গীর দেখা গেল পারদ ছাড়াও আরো বহু ধাতু ও মিশ্র ধাতর (Alloy) মধ্যে এই অতিপরিবহণ ঘটে, যদিও সব ধাতুতে এটা সম্ভব কিনা তা এখনো জানা যায় নি। এক এক জিনিষে অতিপরিবহণ ঘটতে পারে এক একটা বিশেষ তাপমাত্রার নীচে। অবশ্য সবগুলোই খুব নিম্ন তাপমাত্রায়। এ পর্যন্ত যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় অতিপরিবহণ সম্ভব হয়েছে তা নায়োবিয়াম-এলমুনিয়াম-জার্মেনিয়ামের তৈরী একটা মিশ্র ধাততে, পরম শূন্যের ২০ ডিগ্রী উপরে।

অতিপরিবহণের আবিষ্কারের প্রায় বিশ বছর ধরে মনে করা হয়েছে বাধা-শূন্য হয়ে যাওয়াই এর একমাত্র অদ্ভুত গুণ। বাদ বাকী গুণাগুণ সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু তা যদি হয় তবে একটা ধাতুকে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রেখে এর তাপমাত্রা অতিপরিবহণের তাপমাত্রায় নামিয়ে আনলে, বাধা না থাকার জন্য ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ অনুসারে এর ভেতরের চৌম্বকক্ষেত্র স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৩৩ সনে মাইজনারের পরীক্ষার ফলে দেখা গেল তা হয় না। বরং অতিপরিবাহী হওয়ার সাথে সাথেই ধাতুটির ভেতর আর কোন চৌম্বক ক্ষেত্রই থাকতে পারে না। ব্যাপারটিকে বলা হয় মাইজনার ক্রিয়া (Meissner Effect)। এটি অতিপরিবাহী বস্তুর আর এক খেয়ালীপনা। তা ছাড়া প্রযুক্ত

চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা বাড়াতে বাড়াতে একটা বিশেষ তীব্রতায় নিয়ে এলে, বস্তুটির অতিপরিবহণ গুণটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই দু'টি উপায়ে আমরা অতিপরিবাহী বস্তুর অতিপরিবহণ ক্ষমতা নষ্ট করতে পারি—এর তাপ-মাত্রা বাড়িয়ে অথবা নির্দিষ্ট তীব্রতার উপরে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে।

অতিপরিবাহী বস্তুর নানা গুণাগুণের উপর পরীক্ষা চালিয়ে অনেক তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাজ চলার মত কিছু থিওরীও খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু এর আবিষ্কারের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত মূল প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায়নি--পারমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অতিপরিবহণ ঘটে কেন? চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাপারেও বা তার অদ্ভুত খেয়া-লীপনা কেন? ১৯৫০ এর পর থেকে এ সব প্রশ্নের কিছু কিছু জবাব আসতে শুরু করে। আর ১৯৫৭ সনে বার্ডীন, কুপার আর শ্রীফারের BCS থিওরী আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম একটি সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ পরমাণুভিত্তিক তত্ত্ব অতিপরি বহণের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হলো। এই তত্ত্বের প্রথম প্রকাশের পর এর বেশ কিছু উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে যার ফলে অতিপরিবহণের প্রায় সবগুলো ঘটনা আজ এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এবারকার নোবেল পুরস্কার এই গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বেরই স্বীকৃতি দান করল।

কৃতী বিজ্ঞানীত্রয় কি করেছেন তা বলা যত সহজ হলো কি ভাবে করেছেন তা বলা তত সহজ নয়। এর কারণ BCS থিওরী একটা কোয়াণ্টাম তত্ত্ব-নির্ভর থিওরী ; জটিল গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমেই শুধু এতে পৌঁছা যায়। তবুও আমরা চেষ্টা করব এর থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলোর খুব সাধারণ একটা ছবি পেতে। অবশ্য সে চেষ্টা করার আগে জানতে হবে পারমাণবিক ও কোয়াণ্টাম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে একটা ধাতুকে কি রকম দেখায়।

ধাতুর মধ্যে রয়েছে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো অসংখ্য পরমাণু। সারি সারি সজ্জিত এই পুরো পরমাণু বাহিনীকে আমরা বলব ল্যাটিস। ল্যাটিসের পরমাণুগুলো যদিও নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন আর পজেটিভ চার্জযুক্ত নিউ-ক্লিয়াস দিয়ে গঠিত, কিছু ইলেকট্রন এই ল্যাটিসের বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে ধাতুর ভেতর যত্রতত্র ঘুরঘুর করতে পারে এদেরকে আমরা বলব মুক্ত ইলেকট্রন। এর পর থেকে ইলেকট্রন বলতে আমরা শুধু মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকেই বুঝব, কারণ প্রধানতঃ এগুলো নিয়েই এক্ষেত্রে আমাদের কারবার। মুক্ত ইলেকট্রন-

গুলোর তেজ ও গতিবেগ এমনভাবে বণ্টন করা থাকে যেন প্রত্যেক ইলেকট্রনের একটা আলাদা ও একক তেজ থাকে। কাজেই বলা যেতে পারে প্রত্যেক ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট তেজের অবস্থা (Energy state) দখল করে থাকে, যেখানে অন্য আর কোন ইলেকট্রন থাকতে পারে না।

তাপমাত্রা যখন পরমশূন্য তখন নীচের দিক থেকে শুরু করে একটা সর্বোচ্চ অবস্থা পর্যন্ত সবগুলো তেজের অবস্থা ইলেকট্রন দিয়ে ভর্তি থাকে। এই সর্বোচ্চ তেজের অবস্থাকে বলা হয় ফার্মী তেজ (Fermy Enesgy)। ফার্মী তেজের উপরেও তেজের অবস্থা আছে, তবে পরমশূন্য তাপমাত্রায় তা খালি থাকে। এবার তাপমাত্রা এর উপরে তোলা হলে কিছু কিছু ইলেকট্রন যারা ফার্মী তেজের কাছাকাছি তেজের অবস্থায় ছিল সেগুলো উত্তেজিত (Excited) হয়ে ফার্মী তেজের উপরের অবস্থায় চলে যাবে। তাছাড়া ধাতুর উপর ভোল্টেজ বা বিদ্যুৎ চাপ প্রয়োগ করলে কিছু কিছু মুক্ত ইলেকট্রন এর প্রভাবে গতিবৃদ্ধি করে অন্য খালি তেজের অবস্থায় চলে যাবে। এ ভাবে ভোল্টেজের প্রভাবে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো যখন দলবদ্ধভাবে একদিকে গতিলাভ করে তখনই আমরা বলি বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে। যেহেতু ধাতুর মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো যে সব তেজের অবস্থায় থাকে তার অনেকগুলোর কাছাকাছি খালি অবস্থায় থাকে, কাজেই গতিলাভ করে একটা থেকে আরেক অবস্থায় চলে যেতে এদের কোন অসুবিধা হয় নি। একারণেই বেশীর ভাগ ধাতু ভাল বিদ্যুৎ পরিবাহী।

আমরা আগেই দেখেছি ল্যাটিসের পরমাণুগুলো সারি সারি সাজানো থাকে সুশৃঙ্খলভাবে। কাজেই বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় ইলেকনট্রগুলো দুই সারির মাঝখান দিয়ে অবাধে চলে যেতে পারে কোন বাধা না পেয়ে। যেন একটা পরিকল্পিত বনের মধ্যে সারি সারি গাছ লাগানো হয়েছে আর তার ভেতর দিয়ে একটা ফুটবল চলে যাচ্ছে কোন ধাক্কা না খেয়ে। কিন্তু মুস্কিল বাধবে যদি মাঝে মাঝে দু'একটা গাছ ভুল করে দু'সারির মাঝখানে লাগানো হয়, সারি ভুল হয়ে যায় বা বাতাসে গাছগুলো প্রচুর দুলতে থাকে। তখন ফুটবলটা ধাক্কা খেয়ে এদিক ওদিক ছিটকে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা। অনেকটা এই জিনিষটা ঘটে ধাতুর মধ্যেও। সত্যিকার একটি ল্যাটিসের সারিতে এখানে ওখানে নানা গলদ থাকে। তাছাড়া ল্যাটিসের পরমাণুগুলোর সব সময়ই একটা কম্পন থাকে যা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। এসব গলদ ও কম্পনের ফলে কিছু কিছু ইলেকট্রন সব সময়ই ধাক্কা খেয়ে মূল প্রবাহ থেকে এদিক ওদিক ছিটকে যায়, ও অন্য

তেজের অবস্থায় চলে যায়। তাছাড়া এর জন্য কাছাকাছি খালি তেজের অবস্থা তো সব সময় মজুদ আছেই। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ কিছুটা ব্যাহত হয় এবং পরিবহণে আমাদের সুপরিচিত বাধার (Resistance) সৃষ্টি হয়।

উপরে যত কথা বলা হল সবই ধাতুর সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন দেখতে হবে অতিপরিবাহী অবস্থায় এর এমন কি রদবদল হয় যার ফলে বাধাটা শূন্য হয়ে যায় এবং অন্যান্য সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এটাই BCS থিওরীর কাজ। এতে দেখা যায়, অতিপরিবাহী অবস্থায় দুই বিভিন্ন ইলেকট্রনের সাথে ল্যাটিসের পরস্পর ক্রিয়ার (Interaction) ফলে ঐ দুই ইলেকট্রনের মধ্যে একটা আকর্ষণের সৃষ্টি হতে পারে, উভয়ের সমধর্মী চার্জ থাকা সত্ত্বেও। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা যেতে পারে : একটা ইলেকট্রনের সাথে ল্যাটিসের পরস্পর ক্রিয়ার ফলে ল্যাটিসের প্রকৃতিতে কিছু রদবদল হয়, অন্য ইলেকট্রনটা আবার এই রদবদলের সুযোগ নিয়ে ওখানে গিয়ে নিজের তেজটা কিছু কমিয়ে নিল (পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে সব জিনিষ চায় যথাসম্ভব অল্প তেজ নিয়ে থাকতে), এ যেন একটা মার্বেলের ঘা লেগে কার্পেটে একটা টোল পড়ল, আর অন্য একটি মার্বেল গড়িয়ে সেই টোলে গিয়ে পড়ল। আমাদের কাছে মনে হল দুটা মার্বেল যেন পরস্পরকে আকর্ষণ করে জোড়ায় থাকতে চাচ্ছে। এভাবে অতিপরিবাহী অবস্থায় আলাদা আলাদা ইলেকট্রনের বদলে আমরা পেলাম ইলেকট্রন জোড়া (Electron pair)। জোড়ার দুই ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণে উভয়ের তেজ কিছুটা কমে যায়। শুধু তাই নয়, এর উপর কাছাকাছি অন্য সব ইলেকট্রন জোড়ার সমবেত ক্রিয়ায় জোড়ার ইলেকট্রন দু'টার মধ্যে আর একটা নতুন ও আরো শক্তিশালী আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এ ধরনের সমবেত ক্রিয়ার ফলে ভর্তি তেজের অবস্থাগুলো, আর উপরের খালি উত্তেজিত তেজের অবস্থাগুলোর মাঝখানে একটা তেজ-ব্যবধানের (energy gap) সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে কোন তেজের অবস্থা থাকতে পারে না (অর্থাৎ কোন ইলেকট্রনের ঐ পরিমাণ তেজ থাকতে পারে না, হয় তার নীচে থাকতে পারে, নইলে উপরে)। ফার্মী তেজটা থাকে এই তেজ-ব্যবধানের ঠিক মাঝখানে। BCS থিওরী হিসেব করে দেখিয়েছে, এই তেজ-ব্যবধানের পরিমাণ কতখানি। পরে সরাসরি পরীক্ষার মারফত হুবহু এই পরিমাণ তেজ-ব্যবধান দেখা গিয়েছে অতিপরিবাহী বস্তুর মধ্যে।

এখানেই BCS থিওরীর সাফল্য। কারণ অতিপরিবাহী অবস্থায় যত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তার প্রায় সবই এই তেজ-ব্যবধানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা চলে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ শূন্য বাধার কথাই ধরা যাক। অতিপরিবাহী ধাতুতে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো অর্থাৎ ইলেকট্রন জোড়াগুলো গতি লাভ করে এবং বিদ্যুৎ পরিবহণ শুরু হয়। তেজ-ব্যবধান এতে কোন বিঘ্ন ঘটায় না, কারণ ব্যবধানটি ফার্মী তেজের সাথে বাঁধা থাকে, ল্যাটিসের সাথে নয়। ফলে ভোল্টেজের প্রভাবে ফার্মী তেজ, ব্যবধান সব নিয়েই সব ইলেকট্রনের তেজ প্রয়োজনমত সরে যেতে পারে। (অপরিবাহী বস্তুতে এক ধরনের তেজ ব্যবধান থাকে যা ল্যাটিসের সাথে বাঁধা থাকে। ভোল্টেজ দিলেও ব্যবধানটি একই জায়গায় থেকে যায়। এই ব্যবধান পার না হয়ে ইলেকট্রনগুলো আর কোন তেজের অবস্থায় যেতে পারে না ফলে কোন পরিবহন সম্ভব হয় না)। এখন দেখা যাক অতিপরিবাহী বস্তুতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে কিনা। আমরা দেখেছি ধাক্কা খেয়ে কিছু ইলেকট্রন অন্য তেজের অবস্থাতে চলে যেতে পারলেই শুধু প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে সেটা হতে পারে ইলেকট্রন জোড়াগুলো ভেঙ্গে গিয়ে জোড়ার উভয় ইলেকট্রন তেজ-ব্যবধান অতিক্রম করতে পারলে আর তা করতে অন্ততঃ তেজ-ব্যবধানের সমপরিমাণ বাড়তি তেজ প্রয়োজন। BCS থিওরীর মতে তেজ-ব্যবধানটি এতই চওড়া যে অতি পরিবহণের তাপমাত্রার নীচে উত্তাপ থেকে এই বাড়তি তেজ পাওয়া অসম্ভব। ফলে প্রবাহের পথে ধাক্কা খেয়ে অন্য তেজের অবস্থায় যাওয়া অসম্ভব, প্রবাহে কোন বাধা পাওয়াও অসম্ভব। অতএব শূন্য বাধা ও অতিপরিবহণ।

ধাতুর তাপমাত্রা বাড়ানো হলে ল্যাটিসের পরমাণুগুলোর নড়াচড়া বেড়ে যায়। এর ফলে বিভিন্ন ইলেকট্রন জোড়াগুলোর মধ্যে পরস্পর ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং তেজ-ব্যবধানটি কমে যায়। একটা বিশেষ তাপমাত্রার উপরে ব্যবধানটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। অতিপরিবহণও আর সম্ভব হয়না। তাছাড়া তেজ ব্যবধানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় কেন মাইজনার ক্রিয়া ঘটে, তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে কেন অতিপরিবহণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, ইত্যাদি সবগুলো জিনিষ।

বার্ডীন, কূপার আর শ্রীফারের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে অতিপরিবহণের রহস্যটা কিছু আলোচনা করা গেল। কিন্তু অতিপরিবহণের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে দু'চার কথা না বল্লে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতিপরি-

বহণ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক এত উৎসাহের একটা বড় কারণই হল এর বহুল প্রয়োগের সম্ভাবনা। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পরপর প্রফেসর কূপার বলেন, "বিজ্ঞানী জগৎ এই কাজের গুরুত্ব বহু আগেই স্বীকার করেছে, এখন মনে হচ্ছে সর্বসাধারণও এর গুরুত্ব স্বীকার করলেন।" এর একটা কারণ হতে পারে গত কয়েক বছরে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অগ্রগতি।

অতিপরিবহণের যে ব্যবহারের কথা চট করে মনে হয় তা হল এর সাহায্যে অতিচুম্বক (Supermagent) তৈরী করা। লোহার চারিদিকে তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে ওটা চুম্বক হয়ে যায়— এটা জানা কথা। প্রবাহ যত বেশী হবে এর চুম্বকত্বও তত তীব্র হবে। খুব শক্তিশালী চুম্বকের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবাহ বজায় রাখতে খুবই ব্যয়সাধ্য জবড়জঙ্গ আয়োজন করতে হয়। অথচ যদি অতিপরিবাহী তার ব্যবহার করা হয় তা হলে প্রবাহ একবার শুরু করে দিলেই হয়। এটা চলতেই থাকবে আর চুম্বকত্বও বজায় থাকবে কোন তেজ-ক্ষয় ছাড়া। শুধু তারটাকে প্রয়োজনীয় নিম্নতাপে রাখতে হবে যাতে এটা সব সময় অতিপরিবাহী অবস্থায় থাকে। অবশ্য একটা মুস্কিল এতে আছে। আমরা দেখেছি, নির্দিষ্ট একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের উপরে পরিবহণ ক্ষমতা বজায় থাকেনা। এই কারণে অতিচুম্বকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে বহু বছর কেটে গিয়েছে। ১৯৬১ সনে প্রথম এমন জিনিষ পাওয়া যায় যার সাহায্যে যথেষ্ট শক্তিশালী অতিচুম্বক তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, এর অতিপরিবহণ ক্ষমতা নষ্ট না করে। এরপর থেকে নানা কাজে বহু ধরনের অতিচুম্বক ব্যবহার করে আসা হচ্ছে।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বৈদ্যুতিক পাওয়ার নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়ার লাইনে বাধা পেয়ে প্রচুর তেজ ক্ষয় হয়; অতিপরিবাহী তারের সাহায্যে বাধাহীন প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারলে এই অপব্যয় বন্ধ করা যায়। বর্তমানে অবশ্য প্রয়োজনীয় নিম্ন তাপের জন্য যে পরিমাণ তরল হিলিয়াম ব্যবহার করতে হবে তার খরচই পড়ে যাবে অনেক। বর্তমানে এই খরচ না পোষালেও ভবিষ্যতে পোষাতে পারার সম্ভাবনাই বেশী। তাছাড়া ক্ষয়হীন অতি-পরিবাহী ট্রান্সফর্মারের সম্ভাবনাও আজকাল খুব আকর্ষণীয় মনে করা হচ্ছে।

অতিপরিবহণের আরেকটা চমৎকার ব্যবহার হলো কম্পিউটারকে 'স্মরণ-শক্তি' (memory) দেবার ব্যাপারে। কম্পিউটারের মস্ত গুণই হল ছোট ছোট অসংখ্য তথ্য এটা মনে রাখতে পারে যতদিন খুশী ততদিন। এক একটা তথ্য

মনে রাখার জন্য অতিপরিবাহী ছোট একটা তারের বর্তনীতে একটা দুর্বল বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে রাখা যায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য। প্রবাহটা যদ্দিন খুশী তদ্দিন রাখা যায়, ফলে 'স্মরণ শক্তিও'। অতিপরিবহণের বদৌলতে এরকম অসংখ্য প্রবাহ বহুদিন ধরে বজায় রাখা যায় খুবই অল্প খরচে। ফলে অপেক্ষাকৃত সস্তা, ছোট অথচ খুবই নির্ভরযোগ্য কম্পিউটার তৈরীর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১৯৭২

লেজার : একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা

ছোটবেলায় হাতে একটা টর্চ পেলেই সেটা বহু দূরের গাছপালার উপর মেরে মজা দেখতাম। আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে আলো দিয়ে ভাবতাম যদি ওই দূরে মেঘ বা চাঁদের (তখন দুটাকে সমান দূরে বলে মনে হত) উপরে টর্চ মেরে একে আলোকিত করতে পারতাম তবে কি মজাই না হয়! ইলেক-ট্রনিকস বিদ্যার আধুনিকতম যে আবিষ্কার তার মাধ্যমে ঠিক এই জিনিষটাই সম্ভব হয়েছে—যদিও ছেলেখেলার জন্য অবশ্যই নয়।

আবিষ্কারটির নাম লেজার (LASER)। এটা তার আসল নাম নয়, ডাক নাম, আসল নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে গঠিত। এর আসল নাম Light Ampli fication by Stimulated Emission of Radiation অর্থাৎ উত্তেজিত বিকিরণের মাধ্যমে আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি। আবিষ্কার হিসেবে লেজার একটি গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত যার প্রত্যেকটি বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ চৌম্বক বিকিরণের উপর কাজ করে বটে কিন্তু এদের কর্মপদ্ধতি একই রকমের। এরা হচ্ছে মেজার (MASER) ইরেজার (IRASER), রেজার (RASER), আভেজার (UVESER), জেজার (XASER) এবং গেজার (GASER)। নামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে যে এদের আদ্যাক্ষরেই শুধু গরমিল, আলোর পরিবর্তে যথাক্রমে মাইক্রো ওয়েভ, ইনফ্রারেড, রেডিও ওয়েভ,আলট্রা ভায়োলেট, এক্সরে এবং গামা রশ্মি নিয়েই এদের কারবার। এই গোষ্ঠির মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয় মেজার। ১৯৫২ সালে জে ওয়েবার প্রথম এর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন এবং ১৯৫৫ সালে টাউনস একে বাস্তবায়িত করেন! একই সূত্র ধরে তিনিই শাওলোর সহায়তায় ১৯৫৮ সালে লেজারের উদ্ভাবন করেন। বাস্তবক্ষেত্রে লেজারের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে ১৯৬০-৬১ সনে। কাজেই আবিষ্কার হিসেবে লেজারকে বেশ আনকোরাই বলতে হয়।

আলো বা অন্যান্য বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গের তীব্রতা আগেও বৃদ্ধি করা সম্ভব হত। তবে সে ক্ষেত্রে একে বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে সেই বিদ্যুতকেই সাধারণ য়্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে পরিবর্ধিত করা হত এটা ছিল পরোক্ষ

উপায়। লেজার আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি করে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে পরমাণুর আলোক বিকিরণ অবস্থায় রদবদল করে। তাই এর কর্মপদ্ধতি বুঝতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে একেবারে পরমাণুর জগতে, যেখানে পরমাণ কোয়া-ণ্টাম তত্ত্ব অনুসারে গুচ্ছ গুচ্ছ তেজ বিকিরণ করে থাকে। এই তেজগুচ্ছ-গুলোকে বলা হয় এক একটা কোয়াণ্টাম বা ফোটন। স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু এই ফোটনের আকারেই তেজ গ্রহণ করে ও বিকিরণ করে।

পরমাণুর ভেতর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের চারিদিকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। এসব কক্ষপথকে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের ভাষায় বলা যায় এক একটা তেজমাত্রা। এখন পরমাণু যদি একটা ফোটন আত্মস্থ করে তাহলে এটা স্বাভাবিক তেজমাত্রা ছাড়িয়ে একটি উত্তেজিত মাত্রায় গিয়ে পোঁছাবে। এই উত্তেজিত অবস্থায় পরমাণু বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

এর পরে পরেই এটা আপনা আপনি একটা ফোটন বিকীর্ণ করে আবার স্বাভাবিক তেজমাত্রায় ফিরে যায়। এখন বিশেষ বিশেষ মাধ্যমের ভেতর এই বিকীর্ণ ফোটনটি আশে পাশে অন্য একটি উত্তেজিত পরমাণুকে এমনভাবে আঘাত করে যে সাথে সাথেই ওটা একটা ফোটনের বিকিরণের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক তেজমাত্রায় ফিরে যায়। এই দ্বিতীয় ফোটনটির শক্তি হয় প্রথমটার ঠিক সমান। এভাবে আমরা একটির জায়গায় সমশক্তি বিশিষ্ট দুটো ফোটন পেয়ে গেলাম। এই দুটো ফোটন আবার একই উপায়ে আরো ফোটনের সৃষ্টি করবে। এভাবে শুরুতে একটা মাত্র ফোটন থেকে আমরা অসংখ্য ফোটনের সৃষ্টি করতে পারি—যদি ফোটনগুলোকে বেশ কিছুক্ষণ ঐ বিশেষ মাধ্যমের মধ্যে আটকে রাখা যায়।

রুবির স্ফটিক লেজারের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। একটা রুবিদণ্ডের দুই প্রান্তে এমন একটা অপরিবাহী ঈষদচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় যেন আলোর ফোটনগুলো এতে বার বার প্রতিফলিত হয়ে রুবিদণ্ডের মধ্যেই থেকে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্যামিতিক হারে ফোটন বৃদ্ধির ফল স্বরূপ খুবই তীব্র একটি আলোক রশ্মি রুবিদণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে। উত্তেজিত বিকিরণের এই হচ্ছে মূল কথা।

এভাবে ফোটন বৃদ্ধি-ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে হলে স্বাভাবিক তেজমাত্রায় যত পরমাণু থাকবে তার চেয়ে বেশী থাকতে হবে উত্তেজিত অবস্থায়। কিন্তু

বাস্তবে এর ঠিক উল্টোই দেখা যায়। ভারসাম্যের অবস্থা বজায় রাখতে হলে স্বাভাবিক পরমাণুই বেশী থাকার কথা। উত্তেজিত পরমাণুর সংখ্যা বাড়াতে হলে তাই ত্রি-মাত্রা ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হয়। এতে উত্তেজিত পরমাণু ফোটন বিকীর্ণ করে একেবারে স্বাভাবিক মাত্রায় এসে যায় না, মাঝামাঝি একটা তেজমাত্রায় এসে থাকে। ক্রমে এই মাঝামাঝি অবস্থার পরমাণুর সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থারি পরমাণুর চেয়ে বেশী হয়ে পড়ে এবং লেজার ক্রিয়া সম্ভব হয়।

এ পর্যন্ত লেজারের তিন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। এরা স্বচ্ছ কঠিন, গ্যাসীয় ও স্বল্প পরিবাহী পদার্থ। এদের পরমাণুর উত্তেজন পদ্ধতি বিভিন্ন। রুবি লেজারের কথা আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। এটা স্বচ্ছ কঠিনের পর্যায়ে পড়ে। মাধ্যমের ঘনত্বের উপর প্রাপ্ত তীব্রতা নির্ভর করে বলে এই লেজারের তীব্রতা হয় সবচেয়ে বেশী। আনুসঙ্গিক একটি গ্যাসভর্তি টিউব (অনেকটা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত আলোর মত) হঠাৎ জ্বালিয়ে লেজার প্রক্রিয়া শুরু করা হয় অর্থাৎ প্রথম কয়টি ফোটন সরবরাহ করা হয়। হিলিয়াম ও নিয়ন গ্যাসের মিশ্রণকেও লেজার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তীব্রতা কিছু কম হলেও এতে খুব সরু ও বিশুদ্ধ ফ্রিকোয়েন্সির আলোক রশ্মি পাওয়া যায়।

একটি বিশুদ্ধ ফ্রিকোয়েন্সির (রঙের) খুব সরু ও তীব্র আলোক রশ্মির অসংখ্য বাস্তব ব্যবহার সম্ভব। এ জন্যই সর্বাধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেজার মেজারের নাম এত বেশী শোনা যায়। ব্যবহারের সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমনি তার ধরনও নানাবিধ। আমরা এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান ব্যবহারের কথা উল্লেখ করব।

সাধারণ আলোক ব্যবহার করে ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্র দিয়ে বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত দূরত্ব মাপা যায়। তার কারণ এ আলো দিয়ে খুব দূরে ইন্টারফেরেন্স ঘটানো যায় না। অথচ গ্যাস লেজার ব্যবহার করে ৫০ মীটারেরও উপর দূরত্বে ইন্টারফেরেন্স ঘটানো যায়।

দূরত্ব নির্ণয়ে লেজার খুবই উপযোগী। এর তীব্র আলো লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে উৎসে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তার থেকে এই দূরত্ব হিসেব করে বের করা যায়। এর একটা মস্ত সুবিধা হল, এর আলো সমান্তরাল হওয়ায় এটা যে কোন বস্তু থেকে ভালভাবেই প্রতিফলিত হতে পারে, তা সে বস্তুর প্রতিফলন ক্ষমতা যতই কম হোক না কেন।

রাডার যন্ত্রের সাথে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। রাডার (RADAR)-এর পুরো নাম Radio Detection And

Ranging অর্থাৎ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ মারফত অনুসন্ধান ও দূরত্ব নির্ণয়। এর নয়া সংস্করণ হচ্ছে লিডার (Light Detection And Ranging)। এতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গের পরিবর্তে সাধারণ আলোক ব্যবহার করা হয়। এটা সম্ভব হয়েছে লেজারের কল্যাণে। আলোর ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও তরঙ্গের চেয়ে ১০০,০০০ গুণ বেশী হওয়ায় এটা খুব ছোটখাট জিনিষ থেকেও ভালভাবে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। এ কারণে বায়ুমণ্ডলের ধুলো-বালি বা জল-কণিকার অনুসন্ধান কার্যে লিডার ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

খুব স্থায়ী ধরনের স্পন্দনকারী যন্ত্রে (oscillator) লেজার ব্যবহার করা হয়। একে পারমাণবিক ঘড়ি সমূহের দোলক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ ঘড়ি এক হাজার বছরে বড় জোর এক সেকেণ্ড ফাষ্ট বা স্লো হতে পারে।

লেজারের তীব্র আলো ব্যবহার করে তীব্র তাপের সৃষ্টি করা যায়। ধাতুর ওয়েল্ডিং প্রভৃতি কাজে তাই এর ব্যবহার সম্ভব। বেতার তরঙ্গে কি পরিমাণ সিগন্যাল এক সাথে পাঠানো যায় তা নির্ভর করে তার ফ্রিকোয়েন্সির উপর। আলোর ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশী বলে যদি কোন প্রকারে সিগন্যালগুলোকে আলোক তরঙ্গের রূপ দান সম্ভব হয় অর্থাৎ আলোর মড্যুল্যাশন সম্ভব হয় তা হলে বেতারের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর এসে যাবে। বর্তমানে পৃথিবীর সবগুলো রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় যত সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছে একটি মাত্র লেজার রশ্মি ব্যবহার করে তার সবগুলো একসাথে পাঠানো সম্ভব হবে।

ইনফ্রারেড আলোর খুব তীব্র রশ্মি ব্যবহার করে বিভিন্ন অণুর উপস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ অণুর কম্পনকে উত্তেজিত করা সম্ভব। তখন উত্তেজিত অণু অন্যান্য অণুর চেয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় বেশী সক্রিয় হবে। এভাবে কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ অংশের উপর আশ্চর্য রকমের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে। এতদিন যথেষ্ট পরিমাণ তীব্র আলোক উৎস ছিলনা বলে এটা সম্ভব হয়নি।

চোখে টিউমারের অস্ত্রোপচারের জন্য লেজার রশ্মি ব্যবহার করা সম্ভব। এর সুবিধা হচ্ছে এর ফলে আশেপাশের জীবকোষগুলো নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ের জন্য লেজার রশ্মি ব্যবহার করতে হয়। এই সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে চোখের নড়াচড়া হয়ে রশ্মি ভুল জায়গায় গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। তা ছাড়া এই স্বল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশী তাপও সৃষ্টি হতে পারে না। এ ছাড়াও নানা ধরনের অস্ত্রোপচারের একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র হিসেবে লেজারের ব্যবহার সম্ভব।

খুব দ্রুতগতি ফটোগ্রাফির জন্যও লেজার অপরিহার্য। শরীরের পেশী সমূহ ও জীবকোষের নানা দ্রুত পরিবর্তনের ছবি নিতে হলে এ ধরনের দ্রুত-গতির প্রয়োজন।

এ ধরনের আরো বহুবিধ কাজ লেজার দ্বারা সম্ভব হয়েছে অথবা হতে পারে। লেজারের আবিষ্কার ইলেকট্রনিক্স বিদ্যার একটা নূতন দিক খুলে দিয়েছে। একমাত্র ভবিষ্যতই এর পুরাপুরি সন্ধান দিতে পারবে।

১৯৬৭

পদার্থ বিদ্যার পরিসর

হার্ডিকে 'গণিতবেত্তার কৈফিয়ত' লিখতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ কোন পদার্থবিদকে এ পর্যন্ত এই সুরে কিছু লিখতে হয়নি। তবুও সারা বিশ্বে এবং কিছু পরিমাণে আমাদের দেশেও পদার্থবিদ্যার দিকে মেধাবী ছাত্ররা যে আকর্ষণ অনুভব করে তার অনেক কারণ আছে বৈকি। এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন, বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে পদার্থবিদ্যাকে বিশ্বদর্শনের সাথে সম্পর্কহীন একটা যান্ত্রিক বিষয়বস্তু মনে করার প্রবণতা আছে। পদার্থ-বিদ্যার প্রকৃত সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণাতেই এ প্রবণতার উৎপত্তি।

এক কথায় বলতে গেলে পদার্থবিদ্যা হল প্রকৃতিবিজ্ঞানের সেই শাখা যার ধারণাগুলো পরিমাপের উপর নির্ভরশীল এবং গণিতের সূত্রে রূপ লাভ করতে সক্ষম। এটা আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞানের সেই অংশ যাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা চলে। পরিমাপকৃত তথ্যগুলো গণিতের মাধ্যমে একটা বিমূর্ত ও আদর্শ রূপ লাভ করে এবং ধারণা এগিয়ে যাওয়ার বাহন পায়। সুকুমার কলার ক্ষেত্রে একটা কথা আছে যে, সব কলা সঙ্গীত হতে চায়, কারণ একমাত্র বিশুদ্ধ সঙ্গীতেই মাধ্যমের বাহুল্যটুকু নেই; বিশেষ একটা কিছুর সাথে নিজেকে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নেই। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক চিত্রকলার বিমূর্ততা এই সঙ্গীত-মুখী প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি বলা যেতে পারে যে, সব বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা হতে চায় অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার ভাষায় প্রকাশিত হতে চায়। কোন কোন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা ইতিমধ্যেই সম্ভব হয়েছে, যে সব বিজ্ঞানকে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্স বলি সেগুলো মোটামুটি এ পর্যায়ে পড়ে। অন্যান্যগুলো যেমন জীববিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান; এ সব এখনো পদার্থবিদ্যা অভিমুখী প্রচেষ্টার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। উদ্ভিদবিদের স্বপ্ন সালোক সংশ্লেষণ (Photo Synthesis) ক্রিয়ার যাবতীয় পদ্ধতি বুঝে নিয়ে উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়াই এর পুনরাবৃত্তির চেষ্টা। অথচ এটা সফল হতে হলে বুঝতে হয় এর সব রাসায়নিক ক্রিয়া অর্থাৎ এর অণু পরমাণুর ভেতর পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ এদের ইলেকট্রন

সমূহের ব্যবহার। শেষ পর্যন্ত সমস্যাটি পদার্থবিদ্যার আওতায় আসতে বাধ্য। আরেকটা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আধুনিক মনস্তত্ব ব্যবহারবাদী মনস্তত্ব (behaviourist psychology) প্রাধান্য লাভ করেছে, যেখানে মানুষের বাহ্যিক ব্যবহারের থেকে তার মনের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা (inner experience), চেতনা (conciousness) ইত্যাদির স্থান এখন নিচ্ছে বাহ্যিক ব্যবহার যার ফলে পুরো বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল সায়েন্সের মত হয়ে পড়েছে।

পদার্থবিদ্যার এই আদর্শ ভূমিকাকেই কড়াকড়িভাবে ব্যক্ত করে আধুনিক দর্শনে 'ফিজিকালিজম' নামক একটা মতবাদ। এর মতে পুরাপুরি অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য সব জ্ঞানকে পদার্থবিদ্যার ভাষায় প্রকাশ লাভে সক্ষম হতে হবে। কারণ পদার্থবিদ্যার ভাষাই একমাত্র বিশ্বভাষা (universal), এই ভাষাতে রচিত বা অনূদিত হতে না পারলে কোন বাক্যই পুরোপুরি অর্থপূর্ণ হতে পারে না। ফিজিকালিষ্ট না হয়েও অবশ্য আধুনিক দর্শনের প্রধান মতবাদগুলো একটা বিষয়ের উপর মোটামুটি একমত—তা হল দর্শন থেকে অধিবিদ্যাকে (metaphysics) নির্বাসিত করে শুধু কাণ্ডজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বদর্শন সৃষ্টি করা। এভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের যৌক্তিক বিশ্লেষণই দর্শনের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। আর ফ্রেগে ও রাসেল দেখিয়েছেন যৌক্তিক বিশ্লেষণ মানেই হলো গাণিতিক বিশ্লেষণ অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার পথ।

কালোপযোগী বিশ্বধারণার সৃষ্টিতে পদার্থবিদ্যার আবিষ্কারগুলো যে ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে একথা আজ কেউ অস্বীকার করেন না। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার স্থান ও কাল সম্পর্কীয় ধারণা ও নিশ্চয়তাবাদী বলবিদ্যার প্রভাবে এক সময় মনে হত যে বিশ্বজ্ঞান মানুষের হাতের মুঠোয়। লাপ্লাস তাই দম্ভ ভরে বলতে পেরেছিলেন সব বস্তুকণার প্রাথমিক অবস্থান ও গতিবেগ বলে দেয়া হলে তিনি ভবিষ্যত বিশ্বের পুরো ছবি নির্ভুলভাবে দিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু সে সুখ বেশী দিন টিকেনি। আপেক্ষিক তত্ব, অনিশ্চয়তাবাদ ও সর্বাধুনিক মৌলিক কণিকার মৌলিকত্ব নিয়ে নানা জটিলতা বিশ্বের সহজ যান্ত্রিক ব্যাখ্যার চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। যদি কেউ বলে এর ধাক্কা মানুষের সামগ্রিক চিন্তাব্যবস্থায় ও দর্শনে পড়েনি তা হলে ভুল বলা হবে। চিন্তাব্যবস্থাকে তার পরীক্ষামূলক ভিত্তি থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে সে চিন্তা অর্থহীন হবে, বোকার স্বর্গ গড়ার মত হবে। পদার্থবিদ্যা তার বক্তব্য ও ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে অনেকখানি সংযত হয়েছে আগের তুলনায়। এখন একটা জিনিষ আসলে কণা না

তরঙ্গ এ প্রশ্ন সে অবান্তর মনে করে, শুধু বলে সময় সময় এটা তরঙ্গ ও সময় সময় কণার মত ব্যবহার করে এবং উভয় ক্ষেত্রে তার ব্যবহার পদার্থবিদ্যার নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। আসলে ওটা কি, সে প্রশ্ন যদি পদার্থবিদ্যায় অবান্তর হয় তবে এর উত্তর পাওয়া যাবে না অন্য কোথাও, অধিবিদ্যায় তো নয়ই। পদার্থ-বিদ্যা সব সময় বিশ্ব ধারণার মূল ভিত্তি খুঁজে পেতে ব্যস্ত আর এ কারণেই এটা চিন্তাশীল জনকে আকৃষ্ট করে এত বেশী। সব সময় চেষ্টা চলছে কিভাবে আরো কম সংখ্যক মূল ধারণার সাহায্যে পুরো ভিত্তিকে খাড়া করা যায়। বিপ্লবাত্মক নূতন ধারণার ফলে এই ভিত্তি গড়ার কাজে মাঝে মাঝে অদ্ভূত উৎসাহের জোয়ার আসে। কণাবিজ্ঞানী গেলমান একে তুলনা করেছেন অমর সঙ্গীত সৃষ্টির সাথে অথবা মর্মর মন্দির নির্মাণের সাথে। এই জ্ঞান সৃষ্টি এরই মত মহান, আত্মিক দিক থেকে আনন্দদায়ক।

একটা গাছ বা দালান ঝড়ে বিপর্যস্ত হলে তার ভিত্তি নষ্ট হবার আগে উপরের শাখা প্রশাখাই নষ্ট হয় তাড়াতাড়ি। মজার ব্যাপার হলো পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তা হয় না। এখানে নূতন বৈপ্লবিক ধারণা ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিলেও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় যে সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন নিত্য চলছে সেগুলো রাতারাতি বিপর্যস্ত হয়ে যায় না। এর কারণ এই শাখা-প্রশাখাগুলো থাকে পরীক্ষামূলক জ্ঞানের বেশী কাছাকাছি। আর সব কিছু, সব তত্ত্ব ধ্বসে পড়লেও নির্ভুল পরীক্ষার কাছে পদার্থবিদ বারবার ফিরে যেতে পারে নিঃসংশয়ে। পদার্থবিদ্যার বিরাট সৌন্দর্য হল, এখানে পরীক্ষামূলক জ্ঞান ও তাত্ত্বিকজ্ঞান যেভাবে হাত ধরাধরি করে চলে, তা। ম্যাক্সওয়েল যখন তাঁর গাণিতিক সমী-করণের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের মত আলোর গতিতে চলা জিনিষ বৈ কিছু নয়, সেই যুগান্তকারী উপলব্ধি থেকে পরবর্তীকালের সমস্ত রেডিও বিজ্ঞানের সৃষ্টি। আবার ক্রীষ্টালের মধ্য দিয়ে চলাকালে পরীক্ষার মাধ্যমে যখন দেখা গেল ইলেকট্রন রশ্মির এক্সরের মতই ডিফ্রাকশন হচ্ছে তখন এদ্দিন কণা ভেবে আসা ইলেকট্রনের এক জাতীয় তরঙ্গ ধর্ম অস্বীকার করার উপায় রইল না। এই জ্ঞান আধুনিক কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের একটা প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াল। এভাবে তত্ত্ব ও পরীক্ষা বরাবর একে অপরকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর ক্রমাগত সংশোধিত হচ্ছে মূল ভিত্তিটি। এর মধ্য থেকে আবার সৃষ্টি হচ্ছে ফলিত পদার্থবিদ্যার নানান চমকপ্রদ আবিষ্কার যা সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে মানুষের জীবন-যাত্রা। এভাবে নানা বিষয়ের ওপর মৌলিক গবেষণার সাথে সাথে পদার্থবিদ্যা

শিল্প ও কারিগরির জন্য নানান নতুন দিক খুলে দিচ্ছে। যেমন অতিপরিবহণের ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হওয়ার পর এর উপর মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে পদার্থের চমকপ্রদ কতগুলো নূতন গুণ ও অবস্থা সম্বন্ধে জানা গেছে। সাথে সাথে অতিচুম্বক, কম্পিউটার মেমোরি ইত্যাদির মারফত এর চমৎকার ফলিত ব্যবহার সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রথমটা ছাড়া দ্বিতীয়টা সম্ভব হত না, অথচ দ্বিতীয়টার জন্যই প্রথমটা শুরু করা হয় নি।

উল্টো আবার ফলিত ক্ষেত্রে একটা উদ্ভাবন বা একটা বিশেষ কারিগরি টেকনিক মৌলিক গবেষণার একটা বিরাট দিক খুলে দিতে পারে। কঠিন পদার্থের তলদেশের (surface) গুণাগুণ, এর ভেতরকার গুণাগুণের চেয়ে ভিন্ন। নানা কারণে তলদেশের গুণাগুণ সম্পর্কে পদার্থবিদরা উৎসুক হয়েছেন শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকে। এ সম্পর্কে কিছুটা তাত্ত্বিক কাজের চেষ্টাও চলেছিল। কিন্তু সে তত্ত্ব পরীক্ষিত হতে হলে প্রয়োজন ছিল পরিষ্কার তলদেশ সৃষ্টি করে বেশ খানিক্ষণ তাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টার। তারপর তলদেশ ও তার উপর বসা সামান্যতম অণু-পরমাণু সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্যও সূক্ষ্ম টেকনিকের প্রয়োজন। ১৯৫০ সন পর্যন্ত এ সব ছিল না। তার ঠিক পরে এ বিষয়ে কয়েকটি কারিগরি উদ্ভাবনের ফলে তলদেশের গবেষণা সলিড স্টেট পদার্থবিদ্যার একটি মুখ্য দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক মৌলিক গবেষণার অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে কয়েকটি কারিগরী সমস্যার সমাধান।

পদার্থবিদ্যার ব্যাপ্তি ও পরিসর বিশাল। এর এক সীমারেখায় পদার্থবিদ হয়ত জাঁদরেল কণিকা ত্বরকের মারফত মৌলিক কণার মৌলিকত্বের হদিশ নিচ্ছেন। আর এক সীমারেখায় অন্য একজন পদার্থবিদ ভেবে হয়রান হচ্ছেন হয়ত ছোট্ট একটি হিমধারকের (cryostat) মধ্যে ছোট্ট একটা তারের অতি-পরিবহণ গুণাগুণ নিয়ে। আকারে, বহরে বিভিন্ন হলেও দু'জনে মূলতঃ একই সাধনায় রত রয়েছেন, কি ভাবে পদার্থবিদ্যাকে, আর সাথে সাথে মানুষের বিশ্বদর্শনকে আরেক ধাপ এগিয়ে নেয়া যায়, জীবনটাকেও আর একটু সহজতর করা যায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা সরস ও আলাপী ভঙ্গীতে করা হয়েছে এই বইতে। বিষয়বস্তুকে খর্ব না করেও যে সাধারণ ভাষায় সরস বিজ্ঞান আলোচনা সম্ভব প্রবন্ধগুলো তারই প্রমাণ। লেখক ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক ও গত বিশ বছর ধরে জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী' সম্পাদনা করছেন। এই পত্রিকা দীর্ঘদিন এদেশের নব বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং বর্তমান প্রবন্ধ সংকলন তারই একটি দিক প্রতিফলিত করছে।